আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন।

প্রথম ভাগ।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম্. এ, এফ্, সি, এস্,

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক,

অধ্যাপক, রসায়নশাস্ত্র, রাজসাহী কলেজ

প্রাপ্তিস্থান {

গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স্,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস,
২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য ১।০, বাঁধাই ১॥০ টাকা।

১২ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী. বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

বঙ্গসাহিত্যের অনুরক্ত

সেবক

বিদ্যা ও বিনয়ের আধার

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

সুহৃৎ

দিঘাপতিয়ার

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ,

মহাশয়ের করকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

সাদরে অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

গত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধে আমার যে সকল প্রবন্ধ "প্রবাসী", "ঢাকা রিভিউ", "ভারতী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কতক অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইচ্ছা ছিল যে সমগ্র পুস্তকখানি একবারেই প্রকাশিত করিব, কিন্তু প্রেসের অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া পুস্তকের প্রথম ভাগ (ধাতুবর্গ) প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম, দ্বিতীয় ভাগ বাহির করিতে আরও একবৎসর লাগিবে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিবার আমার তিনটি উদ্দেশ্য আছে।— প্রথম, প্রত্যেক ধাতু ও তাহার যৌগিক সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহার সম্বন্ধে আলোচনা, দ্বিতীয়, প্রত্যেক ধাতুর জারণ মারণ প্রক্রিয়ায় কি রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা নির্দ্দেশ করা এবং তৃতীয়, আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণের দ্বারা ব্যবহৃত জারিত ধাতুদ্রব্য, মকরধ্বজ প্রভৃতির রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণ।

প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে দেখিতে পাই, যে আয়ুর্ব্বেদের যত উন্নতি সাধিত হইয়াছে রসায়ন সম্বন্ধে জ্ঞানও তত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বাস্তবিকই বৈদিক-কালে। অথর্ব্ববেদে এতগুলি রোগের মন্ত্রতন্ত্র আছে যে উহার "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যাণি" মন্ত্রগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত করিয়া একত্র মুদ্রিত করিলে পৃথিবীর মধ্যে একখানি আদি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ হয়। এমন কি অথর্ব্ববেদে স্বর্ণ, সীসক, রৌপ্য ও লৌহ

প্রভৃতি ধাতুর বাহ্যিক ব্যবহার হইতে পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগের মারিত ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ (Internal adminstration) সূচিত হইয়াছে। ইংরাজি পুস্তকে দেখিতে পাই যে ইউরোপে প্যারাসেল্‌সস্‌ ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে পারদঘটিত ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রথমে ইউরোপে প্রচলিত করেন, কিন্তু ভারতে তাহার বহুপূর্ব্বে নাগার্জ্জুন (দ্বিতীয় শতাব্দী), অন্ততঃ চক্রপাণি (একাদশ শতাব্দী) কজ্জলীর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভবতঃ প্যারাসেল্‌সস্‌ স্বয়ং পারদ সেবনের জ্ঞান ভারত হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। কারণ পারদ সেবন করিয়া ভারতের যোগীদিগের দীর্ঘ আয়ু সম্বন্ধে প্রবাদ মার্কো পোলো প্রভৃতির গ্রন্থের দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে পঁহুছিয়াছিল। অনেক বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান সমকালীন প্রাচীন ইউরোপীয়-গণের জ্ঞান হইতে সমুন্নত ছিল। তাহা হইবারই কথা ; কারণ অষ্টম শতাব্দী হইতে বোগদাদের বাদসাহদের অধীনে চরক, সুশ্রুত, নিদান, বাগভট প্রভৃতি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং এই সকল আরবী গ্রন্থ ও তাহাদের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপে অন্যান্য গ্রন্থের সহিত সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অধীত হইত। রস্কো ও সর্ল্লামারের কৃত সুবৃহৎ, "রসায়ন" প্রভৃতি গ্রন্থে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবীয় প্রভৃতি সকল প্রাচীন রাসায়নিকগণের কার্য্যাবলীর উল্লেখ আছে, কিন্তু ভারতের সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি, ভাবমিশ্রের নামোল্লেখও নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে তীক্ষ্ণক্ষারের (Caustic alkali) প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনাকালে সুশ্রুতের অতি সুন্দর ক্ষারপ্রস্তুতপ্রণালী লিপিবদ্ধ না করিলে সে ইতিহাস একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিবে। প্রাচীন ভারত লৌহের জন্য জগতে অদ্বিতীয় ছিল ; লৌহের প্রাচীন ইতিহাসে দিল্লী, ধার ও আবুশৈলের লৌহস্তম্ভ, উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহের কড়ির উল্লেখ

না করিলে লৌহের ইতিহাস আদৌ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আশা করি ইউরোপীয় রাসায়নিকগণের দৃষ্টি এদিকে শীঘ্রই পতিত হইবে।

তার পর ধাতুর জারণ মারণ প্রক্রিয়াতে দেখিতে পাই যে ঐ প্রক্রিয়াতে ধাতুর বিবিধ যৌগিক (Compund) প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নাগার্জ্জুন এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক, এবং সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রোক্ত ধাতুর "অয়স্কৃতিবিধিই" ইহার পূর্ব্বাভাস। এই সকল প্রক্রিয়াতে কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে তাহার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং বিবিধ জারিত ধাতুর নমুনা লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে দেখিতে পাই যে কজ্জলী "কালো সল্‌ফাইড অব মার্কারি" (Black sulfide of mercury), রসসিন্দুর ও স্বর্ণ-সিন্দুর "উর্দ্ধপাতিত সল্‌ফাইড অব মার্কারি" (resublimed sulphide of mercury), রসকর্পূর "কেলামেল" (calomel), মারিত লৌহ "ফেরিক অক্‌সাইড" (ferric oxide), মারিত তাম্র "সাল্‌ফাইড অব কপার" (sulphide of copper) ইত্যাদি। এইরূপ বস্তুনির্ণয়ের সার্থকতা যথেষ্ট আছে মনে হয়। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। আজ পর্য্যন্ত রস-সিন্দুর ও স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ দুইটি পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিক উহারা আদৌ পৃথক্ নয়—দেখিতে এক, একই ভাবে দানাদার, গুণেও এক; কারণ রসেন্দ্রসারসংগ্রহকার রসসিন্দুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "নিজানুপানৈর্ম্মরণং জরাঞ্চ হন্ত্যাস্ত বল্লঃ ক্রমসেবনেন," "অনুপানবিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্", "অথস্থং রসসিন্দূরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।" সকলেই জানেন কবিরাজ মহাশয়েরা স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দুর এইরূপে বিবিধ অনুপান সংযোগে বিবিধ রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "প্রবাসী" পত্রিকায় আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলে অনেক প্রতিবাদ

ও বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। সেগুলি বাহুল্যভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে সত্যের জয় আজই না হউক দুইদিন পরে হইবেই।

এ সকল ধাতুঘটিত ঔষধের নমুনা লইয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম। একই দ্রব্য কোনটি সাদা, কোনটি কালো, কোনটী লাল ইত্যাদি। জারিত সীসক কোনটি সাদা, কোনটি হল্‌দে এবং কোনটি ঈষৎ লাল পাইয়াছিলাম। পুটিত লৌহ কোনটি কালো, কোনটি ঈষৎ লাল, আবার কোনটি ঘোর লাল পাইয়াছিলাম। এইরূপ নমুনাবিভ্রাটের দরুণ সকল নমুনার পরিমাণাত্মক রাসায়নিক বিশ্লেষণ (quantitative analysis) করি নাই—করিয়া কোনও লাভ নাই। এইরূপ বিভ্রাট হইবার দুইটি প্রধান কারণ আছে—প্রথম, প্রত্যেক কবিরাজ কেবল চিকিৎসকই নহেন, ঔষধপ্রস্তুতকর্ত্তাও বটে; দ্বিতীয়, বিবিধ গ্রন্থে নানা মতান্তর প্রক্রিয়া থাকার দরুণ বিবিধ উপায়ে ধাতু মারিত হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে এই সকল ধাতুঘটিত ঔষধের একটা সমতা থাকা উচিত (standardised)। নচেৎ সাদা ও কালো নমুনার একই রকমের ফল কি করিয়া হইবে?

পুস্তকখানি ইংরাজিতে না লিখিয়া বাঙ্গালায় কেন লেখা হইল তাহার একটা কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করিবেন; আমার ধারণা এই যে, যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় বাঙ্গালায় লিখিলে সকলে বুঝিতে পারেন তাহা বাঙ্গালাতে লেখা মন্দ নহে। তাহার পর সেই সকল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে কয় দিন লাগে? এইরূপ কার্য্যে ডবল পরিশ্রম লাগে সত্য, কিন্তু মাতৃভাষার গৌরবরক্ষার জন্য এ পরিশ্রম অনেক স্থলে বৃথা হইবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যে সকল পুস্তক হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে, সেইজন্য পৃথক্ করিয়া স্বীকারপত্র

(bibliography) প্রকাশিত হইল না। এই বিষয়ে গণ্ডালের ঠাকুর সাহেবের "A Short History of Aryan medical Science," ডাক্তার শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের "Hindu materia medica" এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "A History of Hindu Chemistry" গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার রায়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত পত্রসংখ্যা উহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণের পত্রসংখ্যার অনুযায়ী।

রাজসাহী
জুলাই, ১৩১৪

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

সূচীপত্র।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি *

অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র।
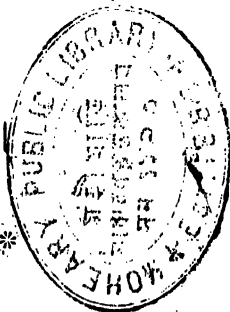
চরক সুশ্রুত প্রভৃতি উত্তরকালীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বতঃই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিবার বাসনা জন্মে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; কেবল দুই একজন এ বিষয়ে ভিন্ন-মতাবলম্বী। (১)

---

* এই প্রবন্ধের পাদটীকায় অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, Caland তাঁহার "Altindisches Zauberritual (Amsterdam, 1900), Dr. P. Cordier "Etude sur la Medicine Hindoue" (Temps Vediques et historiques, Paris, 1894) নামক পুস্তিকায়, এবং Julius Jolly তাঁহার সারগর্ভ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে ("Medicin" 1901, *Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Alterthumskunde* তালিকাভুক্ত) কৌশিকসূত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও বচন উদ্ধৃত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।—আমার বক্তব্য এই যে কৌশিকসূত্রের বহুপূর্ব্বে রচিত অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির মূল।

১। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সার উইলিয়াম জোন্সের (Sir William Jones) মত পণ্ডিত বলিয়াছেন—"There is no evidence that in any language of Asia there exists one original treatise on medicine considered as science."

আমরা এস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র হইতে অভিন্নরূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর ও বিশেষতঃ তাঁহার টীকাকারের গ্রন্থ-নিহিত ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তির বিবরণের সহিত প্রাচীন গ্রীকদিগের ঐরূপ কল্পনার সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ গ্রীকবাসীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অধ্যাপক রায় মহাশয় এই মত সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। (২) ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তিমূলক কল্পনা যে আয়ুর্ব্বেদ কখনও স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করে নাই, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, শার্ঙ্গধরের পরে রচিত ভাবপ্রকাশে ইহার আদৌ উল্লেখ নাই। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন যে, স্বর্ণ সপ্তর্ষির শুক্র হইতে, রৌপ্য শিবের বাম নেত্রের অশ্রু হইতে, তাম্র কার্ত্তিকেয়ের শুক্র হইতে, সীসক বাসুকীর শুক্র হইতে এবং লৌহ লোমিল দৈত্যগণের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এডাল্‌বার্ট কূন্‌ (Adalbert Kuhn) (৩) দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের বৈদিক মন্ত্রের সহিত ইউরোপের টিউটন (Teuton) জাতিদিগের প্রাচীন চিকিৎসার কোন কোন মন্ত্রের সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য কৃমি ও অস্থি-ভগ্ন চিকিৎসায় বেশ সুস্পষ্ট। (৪) এই সামান্য সাদৃশ্য হইতে একের অপরের অনুকরণ প্রমাণিত হইতে পারে না। অবশ্য বিভিন্ন জাতির সহিত সংস্পর্শে তাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে কোন কোন বিষয় আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক এবং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে প্রয়ো-

২। Ray—History of Hindu Chemistry Vol, II. LXXXVI—XC.

৩। ভাবপ্রকাশ (কালীশচন্দ্র সেনের সংস্করণ) ৪১৬—৪২১ পৃঃ।

৪। A. Kuhn :—Zeitschrift fur Vergleicheude Sprachforschung. XIII. p. 49—74 & 113—157.

জনীয়। ভিন্ন জাতির নিকট হইতে এইরূপ গ্রহণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—পর্ত্তুগীজগণের ভারতে আগমনের পর ফিরঙ্গ-রোগে রসকর্পূর ও চোব চিনির ব্যবহার। (৫) এইরূপ গ্রহণ স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়, ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চরক লিখিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদ অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অথর্ব্ববেদ অবলম্বনে উপদিষ্ট হইয়াছে। (৬) সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ (অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ) বলিয়াছেন। (৭) ভাবপ্রকাশ আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও প্রচারের যে বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে "অথর্ব্বসর্ব্বস্ব" আয়ুর্ব্বেদের প্রচারকল্পে প্রথমে ব্রহ্মা "ব্রহ্মসংহিতা" নামক লক্ষ শ্লোকসংযুক্ত একখানি সংহিতা রচনা করেন। তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় "অশ্বিনীকুমারসংহিতা" রচনা করেন এবং ইন্দ্রকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে আত্রেয় মুনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া "আত্রেয়-সংহিতা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনন্তর অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত আত্রেয় মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তৎপরে ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ (অর্থাৎ রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং রোগের ঔষধ) অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পর অনন্তদেবের অংশসম্ভূত চরক মুনি অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণের রচিত তন্ত্রসকলের সংস্কার করিয়া, তাহাদের সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক "চরক-সংহিতা" প্রণয়ন করেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের অনুরোধে দিবোদাস

৫। ভাবপ্রকাশ, ১৬১৯—১৬২৩ পৃঃ।

৬। চরক—সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়।

৭। "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গম্ অথর্ব্ববেদস্য" সুশ্রুতসূত্র স্থান, ১ম অধ্যায়।

নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি "ধন্বন্তরি-সংহিতা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত পিতৃ-আজ্ঞানুযায়ী বারাণসী গমন করতঃ ধন্বন্তরিরূপী দিবোদাসের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থই "সুশ্রুত-সংহিতা" নামে প্রসিদ্ধ। (৮) ইঁহাদের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ (বাগভট্, চক্রপাণি প্রভৃতি) ঐতিহাসিক ব্যক্তি, পৌরাণিক নহেন।

অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল। সুপ্রসিদ্ধ ব্লুম্‌ফিল্ড্ (Bloomfield) সাহেব অথর্ব্ববেদকে যে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যাণি" নামক প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র একখানি অতি প্রাচীন স্বতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদোক্ত মন্ত্রসকল যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ও আদৃত হইয়া থাকে এবং অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসকল তাদৃশ সমাদৃত হয় না; কিন্তু অথর্ব্ববেদ হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট অমূল্য গ্রন্থ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অথর্ব্ববেদকে ভূতপ্রেত-ঝাড়ান মন্ত্রের সমষ্টি মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, প্রাচীন মিশর দেশেও এইরূপ মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (৯) অথর্ব্ববেদকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে আলোচনা করা বোধ হয় ব্লুম্‌ফিল্ড্ সাহেবের দ্বারাই প্রথম হইয়াছে। অধ্যাপক রায় মহাশয়ও তাঁহার হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে এবিষয়ের সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। (১০) এই পরিচ্ছেদটী ব্লুম্‌ফিল্ড্,

৮। ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, প্রথম ভাগ ২—১৪ পৃঃ।

৯। cf. Berthelot's "Les origines de l'alchimie" p. 81-83.

১০। Ray ;—History of Hindu Chemistry p. III—VII, Vol. I.

গ্রিফিথস্ (Griffiths) এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত হুইট্নি (Whitney) সাহেব কৃত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। পাঠান্তরের জন্য এই তিনখানি অনুবাদে কোন কোন স্থলে মিল নাই। যে যে স্থলে অনেকেরই মিল নাই, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ-রচনার সংক্ষিপ্ত সময় নিরূপণ।

ঋক্, যজুঃ, সামবেদে অথর্ব্ববেদের নাম দেখা যায় না ; কিন্তু অথর্ব্ববেদে পূর্ব্বোক্ত তিনখানি বেদের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অথর্ব্ববেদ অপর বেদ অপেক্ষা পরে রচিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে ; অতএব ঐ সকল গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছিল। অথর্ব্ব-বেদের ১৯ কাণ্ডের ৭ সূক্তে লিখিত আছে যে, উহার সঙ্কলন-কালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিম্বা মঘা নক্ষত্রের প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। এই নির্দ্দেশ দ্বারা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় জ্যোতিষ-সূত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ১৫১৬ অব্দে উহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। (১১) অবশ্য সকল কাণ্ডের সকল সূক্ত এককালে রচিত হয় নাই, তবে মোটা-মুটী ধরা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদ প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিহিত চিকিৎসামূলক তথ্যগুলি পৃথিবীর অন্য অন্য জাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ব্লুম্ফিল্ড্ সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, "At any rate the charms of the Atharva-Veda along with such practices as went

বিশ্বকোষ, অথর্ব্ব—১৬৯ পৃঃ

with them represent quite the most complete account of primitive medicine preserved in any literature." (১২)

কৌশিক-সূত্র।

কৌশিকসূত্র অথর্ব্ববেদের একখানি সূত্র। দারিল ও কেশবের টীকা সমেত ইহার একখানি মূল সংস্করণ ব্লুম্‌ফিল্ড্ সাহেব বাহির করিয়াছেন। (১৩) ইহার কোন কোন অংশের অনুবাদ ব্লুম্‌ফিল্ড্ সাহেব কৃত Hymns of the Atharva-Veda নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণের সহিত অনেক প্রকার করণীয় প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে; যথা,—অথর্ব্ববেদের প্রথম কাণ্ডের ২য় সূক্তে এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের ৩য় সূক্তে দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (যথা,—উদরাময়, আমাশয় ইত্যাদি) নিবারণ করিবার জন্য মুঞ্জ ঘাস (Saccharum munja ও ঝরণার জল লইয়া দুইটী মন্ত্র আছে। কৌশিক সূত্রে এই দুইটী মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত নিম্নলিখিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে,—"এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় (যিনি উচ্চারণ করিতেছেন তিনি) একগাছি মুঞ্জ ঘাস (ঐ ঘাস হইতে প্রস্তুত) একগাছি সূতার দ্বারা রোগীর গাত্রে কবচ, তাগা বা মাদুলীর মত বাঁধিয়া দিবেন। তাহার পর খানিকটা মৃত্তিকা ও উই মাটি গুঁড়া করিয়া জলে গুলিবেন এবং ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবেন। তৎপরে রোগীকে ঘৃত মাখাইয়া দিবেন এবং রোগীর

১২। Bloomfield, The Atharva-Veda, p. 58.

১৩। Kaushika-Sutra of the Atharva-Veda, with extracts from the commentaries of Darila and Keshava edited by Maurice Bloomfield, issued as Vol. XIV of the Journal of the American Oriental Society.

গুহ্য দ্বারে ফুঁ দিবেন।" এইরূপ অনেক মন্ত্রের সহিত নানাবিধ করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ কৌশিক সূত্রে আছে। এখন কথা হইতেছে যে, এই সূত্র-লিখিত প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-রচনার সময়ে অথবা তাহার পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে। (১৪) কাহারও কাহারও মত এই যে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-নিহিত এবং ভিন্ন গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত। অপর কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, ঐ সকল প্রক্রিয়া অথর্ব্ববেদের পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত। এই কৌশিক সূত্রে বর্ণিত প্রক্রিয়াসমূহে ভেষজ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় অধিকতর জ্ঞান দৃষ্ট হওয়াতে স্বতঃই মনে হয় যে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের সময় থাকিলেও পরবর্ত্তী কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রক্রিয়াগুলির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কৌশিক সূত্র অথর্ব্ব-বেদের পরে ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদের "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যাণি" মন্ত্রসমূহ।

এই সকল মন্ত্রে অথর্ব্ববেদের সময়ে হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন মন্ত্র কোন কোন রোগকে সম্বোধন

১৪। "The practises there (in the Kaushika Sutra) involve a more extensive Meteria Medica & more elaborate therapeutics, but it is difficult to define in detail the extent to which practices similar to those of the Sutra must be presupposed from the start with the charms of the Atharva-Veda"—Bloomfield's 'The Atharva-Veda," p. 68.

"The value of the Sutra is primarily as a help to the understanding of the ritual setting and general purposes of a given hymn and so mediately to its exegesis' Whitney.—"Hymns of the Atharva-Veda," General Introduction, P. LXXV.

করিয়া রচিত এবং কোন কোন মন্ত্র রোগের প্রতিষেধক ভেষজ ও ধাতুকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত। যে সকল মন্ত্র রোগের প্রতি সম্বোধিত, তাহাতে রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা—"তক্ষণ" বা "জ্বর"। এই তক্ষণের বিষয় অনেকগুলি সূক্তে বর্ণিত আছে—১ম কাণ্ড, ২৫ সূক্ত; ৫ম কাণ্ড, ৪সূক্ত, ২২ সূক্ত; ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৩সূক্ত, ২০সূক্ত, ৯৫ সূক্ত, ১০২ সূক্ত, ১১৬ সূক্ত। ঐ সকল সূক্তে জ্বরের অনেকগুলি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহার ঔষধস্বরূপ "কুষ্ঠ" নামক ভেষজকে (Costus Speciosus or Arabicus) আহ্বান করা হইয়াছে (৫কাঃ ৪সূঃ)। যে সকল মন্ত্র কোনও ভেষজকে সম্বোধন করিয়া রচিত, সেই সকল মন্ত্রে ঐ ভেষজের আকার ও গুণ বর্ণিত আছে। এই সকল ভেষজ বা তাহার রস সেবনের (internal application) বিশেষ উল্লেখ অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায় না। ঐ সকল ভেষজ গলদেশে, হস্তে বা শরীরের অন্যস্থানে মাদুলী, তাগা বা কবজের মত ("পরিহাটক"—পরিহস্ত —বলয়) বন্ধন করা হইত। কৌশিকসূত্রে এই প্রকার বন্ধনের সহিত অন্য অন্য দ্রব্য সেবন করিবার ব্যবস্থাও আছে। যথা, কৌশিকসূত্র ২৫-৬-৯; ২০-১০-১৯; ২৯-২৮-২৯, ইত্যাদি। ধাতুঘটিত ঔষধসমূহের মধ্যে ভূতযোনি তাড়াইবার জন্য সীসকের মাদুলী (১কাঃ, ১৬সূঃ) এবং একশত বৎসর পরমায়ু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্য স্বর্ণের মাদুলী (১কাঃ, ১৬সূঃ) ধারণের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রথমে ঔষধসমূহের বাহ্য ব্যবহার (external application) এবং পরে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত আভ্যন্তরিক ব্যবহার (internal administration) হইয়া থাকে। প্রথমে হস্তে বা গলদেশে ধারণ, পরে মালিস বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে ঔষধরূপে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন, এইরূপেই ঔষধ-সেবনের ক্রমবিকাশ

সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। আমরা অথর্ব্ববেদে ঔষধসমূহের বাহু ধারণে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। যে সকল ভেষজের (যথা অশ্বত্থ, খদির, হরিদ্রা, অপামার্গ, মুঞ্জ, শমী, পৃশ্নপর্ণী ইত্যাদি) বাহু ধারণ অথর্ব্ববেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে সেই সকল ভেষজ ঔষধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতুসকলের মধ্যে সীসক ও স্বর্ণ অথর্ব্ববেদে দেহে ধারণ করিবার ব্যবস্থা আছে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে ঐ দুই এবং অন্যান্য ধাতুর ভস্ম ঔষধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েক পৃষ্ঠায় অথর্ব্ববেদের প্রত্যেক কাণ্ডের মধ্যে যে সকল রোগ এবং ভেষজমূলক সূক্ত আছে, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সেই সকল সূক্তের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়িবে। আমরা এখানে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির দ্বারা সূচিত বিষয়ের উল্লেখ করিব।

প্রথম কাণ্ড।

২য় সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (যথা উদরাময়, আমাশয়) নিবারণের জন্য মুঞ্জ ঘাস (Saccharum Munja) লইয়া মন্ত্র। দ্বিতীয় কাণ্ডে ৩য় সূক্তে এই উদ্দেশ্যে "ঝরণার জল" লইয়া আর একটী মন্ত্র আছে। ষষ্ঠ কাণ্ডে ৪৪শ সূক্তে আরও একটী মন্ত্র আছে। মুঞ্জঘাস বাঁধিবার প্রক্রিয়া কৌশিক সূত্রে (২৫,৬) এবং দারিলের টীকায় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। এই প্রবন্ধের "কৌশিক সূত্র" নামক অধ্যায়ে উহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩য় সূক্ত। **কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রস্রাব বন্ধের** বিরুদ্ধে মন্ত্র। এই সূক্তে পরবর্ত্তী কালের চিকিৎসকগণের বস্তি যন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার তৃণের সাহায্যে চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ আছে। কৌশিক সূত্রে এ বিষয়ে যে

বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কৌশিক সূত্রে (২৫; ১০-১৯) "এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় প্রস্রাবের বেগ যাহাতে হয় এমন দ্রব্য রোগীর গাত্রে বাঁধিয়া দিবে। তাহার পর উইমাটি, পুতিকা, (Guilandina bonduc) শুষ্ক গুঁড়ান প্রমন্দ এবং কাঠের গুঁড়া জলে ভিজাইয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। এই সূক্তের শেষ দুই ছত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মলদ্বারে একটী শলাকা (Enema) প্রবেশ করাইয়া দিবে। তৎপরে মূত্রনালীর মধ্যে শলাকা দিবে। শেষে রোগীকে আল, পদ্মের শিকড় এবং উল এই তিন দ্রব্যের পাঁচন সেবন করিতে দিবে।" কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও এইরূপ ব্যবস্থা।

১৬ সূক্ত। সাসকের মাদুলী। ভূতযোনি তাড়াইবার জন্য ব্যবস্থেয়।

১৭ সূক্ত। রক্তস্রাবের জন্য মন্ত্র। টীকাকারেরা বলেন যে, এখানে রক্তস্রাব অর্থে কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব এবং অত্যধিক রজোনিঃসরণ দুই বুঝিতে হইবে। এই মন্ত্রের সহিত কৌশিকসূত্র (২৬, ১০)ধূলা ও প্রস্তরগুঁড়া আহত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

২২শ সূক্ত। পাণ্ডু ("কামলা"—কেশবের টীকা) রোগের প্রতি মন্ত্র। এ সূক্তে বিশেষ কোন জানিত ভেষজের উল্লেখ নাই। কৌশিক সূত্রে (২৬, ১৪) এই মন্ত্রের সহিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে।

২৩শ ও ২৪শ সূক্ত। শ্বেত কুষ্ঠ রোগের প্রতি মন্ত্র। রজনী (রঞ্জনী, হরিদ্রা, Cacuma longa) এই রোগের প্রতিষেধের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকলে কুষ্ঠরোগে হরিদ্রা ব্যবহার ভূরি ভূরি দেখা যায়। কৌশিক সূত্রে (২৬,২২—২৪) মন্ত্রের সহিত করণীয় আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য ও কেশব তাঁহাদের টীকায় কুষ্ঠের জন্য ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্র-বারুণী ও নীলিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

২৫শ সূক্ত। তক্ষণ (জ্বর) এই সূক্তের এবং নিম্নলিখিত সূক্তগুলির বিষয়— ৫ কাঃ ৪ সূঃ, ২২ সূঃ ; ৬ কাঃ ২০ সূঃ, ৯৫ সূঃ, ৩ সূঃ, ১০২ সূঃ, ১১৬ সূঃ ; ১৯ কাঃ ৩৯ সূঃ। সুশ্রুত যেমন জ্বরকে রোগের রাজা বলিয়াছেন, সেইরূপ অথর্ব্ববেদের সময়ে "তক্ষণ"কে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়প্রদ রোগ বলিয়া মনে করা হইত। এই সকল সূক্তে জ্বরের লক্ষণগুলি বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। লক্ষণগুলি ম্যালেরিয়াজ্বরের সহিত অনেকটা মিলে। প্রধান লক্ষণ—পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও শীতাবস্থা, জ্বর ছাড়িয়া আবার আসা, দুই তিন দিবস অন্তর জ্বর। জ্বরের সহিত মাথাব্যথা, কাশি, বলাস্ (ক্ষয়রোগ), পমন (তক্ষণের ভ্রাতা, চুলকনা) এবং পাণ্ডু (কামলা) আসিয়া যোগ দেয়। উত্তাপ জ্বরের প্রধান লক্ষণ বলিয়া "অগ্নি" জ্বরের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১কাঃ ১২ সূক্তে "বিদ্যুৎকে" বোধ হয় অগ্নির রূপান্তর বলিয়া) জ্বর, মাথাব্যথা ও কাশীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্বর দূর করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ এবং কুষ্ঠ নামক (costus speciosus or arabicus) বৃক্ষের মাদুলীধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে আরও অনেক আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

৩৫ সূঃ। স্বর্ণের মাদুলী—এক শত বৎসর পরমায়ু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্য ধারণ করিবে।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

৩য় সূঃ। প্রথম কাণ্ড ২য় সূক্ত দেখুন।

৪র্থ সূঃ। বিভিন্ন রোগ ও ভূতযোনির জন্য "জঙ্গিড" নামক বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া মন্ত্র। টীকাকারেরা এই "জঙ্গিড" বৃক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, শুধু লিখিয়াছেন "বারাণস্যাং প্রসিদ্ধ"

(বারাণসীতে প্রসিদ্ধ)। ১৪ কাণ্ড ৩৪ সূক্তে এবং ১৯ কাণ্ড ১৫ সূক্তে এই সম্বন্ধে আরও দুইটী মন্ত্র আছে।

৮ম সূঃ। ক্ষেত্রিয় (Hereditary diseases, pulmonary consumption - Griffiths এর অনুবাদ) নামক রোগের মন্ত্র। এই রোগকে টীকাকারেরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত যক্ষ্মারোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। ৩য় কাণ্ডে ৬ সূক্তে হরিণের শৃঙ্গের মাদুলীর ব্যবস্থা আছে। ১৯শ কাণ্ডে ৩৯ সূক্তে কুষ্ঠ বৃক্ষকে অন্য অন্য রোগের মধ্যে যক্ষ্মা আরোগ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

৯ম সূঃ। অথর্ব্ববেদে অনেক স্থলে ভূতযোনি, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অমানুষিক প্রাণীকে রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (৬, ৩৭) এই সূক্তে ঐ সকল ভূতযোনির আক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার জন্য দশ প্রকার বৃক্ষের মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা আছে। এই সকল বৃক্ষের নাম উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

২৫শ সূঃ। পৃষ্ণিপর্ণী (Hemionitis Cordifolia) নামক বৃক্ষের প্রতি মন্ত্র। রোগের হেতুভূত কণ্ব নামক দৈত্যের বিনাশের জন্য পৃষ্ণিপর্ণী নামক বৃক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সুশ্রুত গর্ভস্রাবে দুগ্ধের সহিত পৃষ্ণিপর্ণী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩১শ ও ৩২শ সূঃ। এই দুইটী সূক্ত ক্রিমির মন্ত্র। অথর্ব্ববেদে ক্রিমির জন্য তিনটী মন্ত্র আছে। ৩১ সূক্তে সাধারণ ক্রিমির, ৩২শ সূক্তে পশু ক্রিমির ("গোক্রিমি"—কেশবের টীকা) এবং ৫ম কাণ্ড ২৩শ সূক্তে শিশুগণের ক্রিমির মন্ত্র আছে। এই তিন সূক্তে অনেক প্রকার ক্রিমির বর্ণনা দৃষ্ট হয়—সাদা, কাল, ত্রিমস্তক, চতুর্মস্তক, নানা বর্ণবিশিষ্ট ইত্যাদি। এই সকল সূক্তে কোন প্রকার ভেষজের বর্ণনা

দেখিলাম না, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে কৃমিনাশের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে।

তৃতীয় কাণ্ড।

৫ম সূঃ। **আর্থিক** উন্নতিলাভের জন্য **পর্ণ বৃক্ষের** মাদুলী। এই পর্ণ বৃক্ষ পরবর্ত্তী কালে **পলাস** (Butea Frondosa) নামে অভিহিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ সূঃ। **অশ্বত্থ** বৃক্ষকে শত্রুনাশের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

৭ম সূঃ। ক্ষেত্রিয় রোগের জন্য **হরিণ-শৃঙ্গের** মাদুলী। (২য় কাণ্ড ৮ম সূক্ত)।

চতুর্থ কাণ্ড।

৪র্থ সূঃ। **নষ্ট বীর্য্য** (Impotency) উদ্ধারের জন্য **কপিত্থক** (Feronia Elephantum) নামক বৃক্ষের উদ্দেশ্যে মন্ত্র।

৬ষ্ঠ ও ৭ম সূঃ। বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র। কোনও ওষধির নামের উল্লেখ নাই।

৯ম সূঃ। পাণ্ডু, যক্ষ্মা, দোষস্থ-জ্বরের জন্য **মলম** (Ointment)। কৌশিক সূত্রে (৫৮,৮) উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈদিক ছাত্রের মন্ত্রগ্রহণের পর দীর্ঘজীবন কামনার জন্য যে অনুষ্ঠান হইত তাহাতে মলমের মাদুলী বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

১০ম সূঃ। এই সূক্তে দীর্ঘ জীবনের জন্য **মুক্তার** মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তিগর্ভে পতিত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়, সেই প্রবাদের সূচনা এই সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। (১৫)

১৫। "Born in the sky, ocean-born, brought hither out of the river, this gold born shell forms a life prolonging amulet—IV, 10,4.

১২শ সূঃ। ক্ষত আরোগ্যের জন্য **অরুন্ধতী** নামক লতার উদ্দেশে এই সূক্ত রচিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ৫ম কাণ্ড ৫ম সূক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রে (৫, ৫, ৫) বলা হইয়াছে "হে অরুন্ধতি। তুমি পলাস, অশ্বত্থ, খদির, ধব প্রভৃতি বৃক্ষ অবলম্বনে উঠিয়াছ"। ঐ সূক্তে অরুন্ধতীকে শিলাদি ও লাক্ষা (lac) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে অরুন্ধতীর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় নাই, আবার অনেকে লাক্ষা (বোধ হয় অরুন্ধতীর গাত্রে উৎপন্ন) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উভয় সূক্তেই অরুন্ধতী ক্ষতরোগ আরোগ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১০৯ সূক্তে **পিপ্পলী** (pepper-corn) ক্ষত আরোগ্য কল্পে স্তুত হইয়াছে।

১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ সূঃ। এই তিনটি সূক্তই **অপামার্গ** (Achryranthes Aspera) নামক ঔষধির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। এই অপামার্গ ও তাহার ক্ষার পরবর্ত্তী কালের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তিন সূক্তে অপামার্গের বহু প্রশংসা বর্ণিত আছে, এমন কি ইহাকে "ভেষজসমূহের রাণী" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভেষজ সকলপ্রকার দোষস্থ রোগ, দৈত্য ও পাপ দূর করিতে সমর্থ।

২০শ সূঃ। এই সূক্তে লুক্কায়িত ভূতযোনি আবিষ্কার করিবার জন্য মন্ত্র আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূতযোনিকে অনেক রোগের কারণ বলিয়া অথর্ব্ববেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে (২৮, ৭) এই বিষয়ে করণীয় প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। দারিল তাঁহার টীকায় এই প্রসঙ্গে **সদম্পুষ্প** ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম কাণ্ড।

৪র্থ সূঃ। "তক্মন্" (জ্বর) দূর করিবার জন্য কুষ্ঠ নামক বৃক্ষকে আহ্বান করা হইয়াছে, (১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।)

৫ম স্ঃ। ক্ষত আরোগ্যকল্পে অরুন্ধতীর আরাধনা। (৪র্থ কাণ্ড ১২শ স্কুক্ত।)

১৩শ স্ঃ। **সর্পবিষের** মন্ত্র। ষষ্ঠ কাণ্ড, ১২শ এবং ১৩শ স্থক্তে সর্পবিষের আর দুইটী মন্ত্র আছে। অনেক প্রকার সরীসৃপের উল্লেখ এই তিনটী স্থক্তে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—কিরাতন, ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, চাকা চাকা দাগবিশিষ্ট ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে **মধুর** উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। কৌশিকস্থত্রে (২৯, ২৮-২৯) সর্পবিষের চিকিৎসায় রোগীকে সত্বর **মধুপান** করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

২২শ স্ঃ। তক্ষণ—(১ম কাণ্ড ২৫ স্থক্ত।)

২৩শ স্ঃ। শিশুদিগের কৃমি (২য় কাণ্ড ৩১শ স্থক্ত।)

ষষ্ঠ কাণ্ড।

৩য় স্ঃ। তক্ষণ—(১ম কাণ্ড ২৫ স্থক্ত।)

১২শ স্ঃ। সর্পবিষের মন্ত্র—(৫ম কাণ্ড ২৩ স্থক্ত।)

১৪ স্ঃ। "বলাস" (ক্ষয়রোগ—Consumption) রোগনিবারণের মন্ত্র।

১৬শ স্ঃ। **চক্ষুরোগ** (Ophthalmia) আরোগ্যের মন্ত্র। টীকাকারেরা এই স্থক্তকে "অক্ষিরোগভৈষজ্যম্" স্থক্ত বলিয়াছেন। এই স্থক্তে চক্ষুরোগে, **সরিষার** (mustard) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। কৌশিক স্থত্রে (৩০,১-৭) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—"এই মন্ত্র উচ্চারণের সহিত সরিষা বৃক্ষের মাদুলী সরিষার তৈলে সিক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সরিষার পাতার রস সেবন করিতে দিবে, এবং পাতা বাটিয়া চক্ষের উপর প্রলেপ দিবে।"

২০শ স্ঃ। তক্ষণ—(১ম কাণ্ড ২৫ স্থক্ত।)

২১শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির মন্ত্র। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১৩৭শ ও ১৩শ সূক্তে "নিতত্নী" নামক লতাকে কেশবৃদ্ধির জন্য আরাধনা করা হইয়াছে। এই নিতত্নী লতার স্বরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই। মন্ত্রে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে এই লতা জামদগ্নি তাঁহার কন্যার জন্য মৃত্তিকা হইতে তুলিয়াছিলেন। এই লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে লতে! তুমি পুরাতন কেশকে দৃঢ় কর, নূতন কেশ উৎপাদন কর, এবং বর্ত্তমান কেশগুলিকে ঘন করিয়া দাও (৬, ১৩৬, ২)।" ৬ষ্ঠ কাণ্ডে ৩০ সূক্তে শমীবৃক্ষ (Prosopis Spicigera or Acacia Suma) কেশবৃদ্ধির জন্য আহূত হইয়াছে।

২৪শ সূঃ। শোথ (Dropsy) বক্ষঃপীড়া (heart disease) আরোগ্যের মন্ত্র। এই পীড়ায় স্রোতের জলের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। ৭ম কাণ্ড ৮৩ সূক্তেও শোথের আরও একটী মন্ত্র আছে। কৌশিকসূত্র (৩২, ১৪)।

২৫শ সূঃ। ঘাড়ের উপর গণ্ডমালার মন্ত্র। কৌশিকসূত্র (৩০, ১৪)। ৮৩শ সূক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। ৫৭ সূক্তে গণ্ডমালার চিকিৎসায় "জালস" (গোমূত্র) ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩০শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির জন্য শমীবৃক্ষকে আহ্বান (২১শ সূক্ত) করা হইয়াছে।

৩৭শ সূঃ। রোগের মূলীভূত অপ্সর, গন্ধর্ব্ব সকল দূর করিবার জন্য অজশৃঙ্গীকে (Odina pinata) আহ্বান করা হইয়াছে।

৪৪শ সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (আস্রাব) নিবারণের মন্ত্র। (১ম কাণ্ড ২য় সূক্ত)।

৫৭শ সূঃ। গণ্ডমালার চিকিৎসা এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। "জালস্" অর্থাৎ গোমূত্র এই রোগে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা

যায়। কৌশিক সূত্রে (২২, ১১-১৩) বর্ণিত আছে যে "গণ্ডমালার উপর গোমূত্রের ফেনা লেপন করিবে।" ২৫ ও ৮৩ম সূক্ত দেখুন।

৮০ম সূঃ। **পক্ষাঘাত** আরোগ্য কল্পে সূর্য্যকে এই সূক্তে স্তব করা হইয়াছে।

৮৩ম সূঃ। এই সূক্তে **"অপচী"** ("গণ্ডমালা"—কেশব ও সায়ন) রোগের আরোগ্যের জন্য মন্ত্র নিহিত হইয়াছে। (২৫শ সূক্ত দেখুন)

৮৫ম সূঃ। এই সূক্তে যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্য **ভরণ বৃক্ষের** (ভরণী—Luffa Fœtida * or Caratocua roxburgeii †) মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। কৌশিক সূত্রে (২৬-৩৩-৩৭) এই বন্ধন প্রক্রিয়া সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

৯০ম সূঃ। এই সূক্তে—**"শূলরোগ"** (Colic) নিবারণকল্পে মন্ত্র আছে। এই সূক্তে কোনও ভেষজের নামের উল্লেখ নাই, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীনেরা এই রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা পাইতেন বলিয়া বোধ হয়।

৯১ম সূঃ। **জলমিশ্রিত যব** (barley—যব) সর্ব্বরোগে প্রয়োজ্য বলিয়া এই সূক্তে লিখিত হইয়াছে।

৯৫ম সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০২ম সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০৯ম সূঃ। ক্ষত রোগের চিকিৎসায় **পিপ্পলীর** (pepper corn) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। ৪র্থ কাণ্ড ১২শ সূক্ত।

১১১ম সূঃ। **উন্মাদ** রোগের মন্ত্র।

১১৬ম সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

* Monier William's Sanskrit—English Dictionary.

† Bloomfield.

১২৭ম স্ঃ। এই স্থক্তে **চীপদ্রু বৃক্ষকে** সকল রোগের প্রশমক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৩৬ ও ১৩৭ম স্ঃ। এই দুই স্থক্তে—**কেশবৃদ্ধির** জন্য **নিতত্নী** নামক লতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ২১ স্থক্ত দেখুন।

সপ্তম কাণ্ড।

৫৬ম স্ঃ। সর্প বিষের মন্ত্র—৫ম কাণ্ড ১৩ স্থক্ত।

৭৪ম ও ৭৬ম স্ঃ। এই দুই স্থক্তে **জায়ান্য** নামক অর্ব্বুদের চিকিৎসার মন্ত্র আছে।

৮৩ ম স্ঃ। শোথ রোগের মন্ত্র।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

৩৪ ম স্ঃ। ২ কাণ্ড ৪ স্থক্ত দেখুন।

ঊনবিংশ কাণ্ড।

৩৫ শ স্ঃ। ২ কাণ্ড ৪ স্থক্ত দেখুন।

৩৮ ম স্ঃ। এই স্থক্তে **গুগ্‌গুলুর** (Bdellium) মিষ্ট গন্ধের রোগনাশক ক্ষমতার বর্ণনা আছে।

৩৯ শ স্ঃ। **কুষ্ঠ** বৃক্ষের আরাধনা করিবার মন্ত্র। এখানে কুষ্ঠ বৃক্ষকে সকল প্রকার রোগ (যথা জ্বর, কাশরোগ ইত্যাদি) আরোগ্য করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে—১ম কাণ্ড ২৫ স্থক্ত।

উপরি উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে অতি প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বেশ বিশদ আভাস পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে যে সকল রোগের চিকিৎসা বা যে সকল ভেষজের রোগনাশক ক্ষমতা মন্ত্রাকারে সূচিত হইয়াছে,—সেই সকল রোগ ও ভেষজ সম্বন্ধে কৌশিক স্থত্রে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

অথর্ব্ববেদে নিম্নলিখিত রোগ সকলের চিকিৎসার উল্লেখ আছে।

কোষ্ঠবদ্ধ
প্রস্রাববন্ধ
পাণ্ডু (কামলা)
তক্ষণ (জ্বর)
কাশি
পামণ (চুলকনা)
বলাস (ক্ষয়রোগ)
কুষ্ঠব্যাধি
রক্তস্রাব
আস্রাব (যথা উদরাময়, আমাশয়)
বক্ষঃপীড়া
ক্ষেত্রীয় (Hereditary diseases)
পক্ষাঘাত

ক্রিমি—(গো ক্রিমি, শিশু ক্রিমি)
নষ্টবীর্য্য
বিষ
সর্প বিষ
ক্ষত
চক্ষু রোগ
কেশহীনতা
শোথ
গণ্ডমালা (অপচী)
শূল রোগ
যক্ষ্মা
উন্মাদ রোগ
জায়ান্য (Tumour)

অথর্ব্ববেদে নিম্নলিখিত ভেষজ ব্যবহার ও ধাতু প্রভৃতির বাহ্য ধারণ সূচিত হইয়াছে।

কুষ্ঠ বৃক্ষ
রজনী (রঞ্জনী, হরিদ্রা)
মুঞ্জঘাস
জঙ্গিড
দশ প্রকার বৃক্ষ
পৃষ্ণিপর্ণী
পর্ণ বৃক্ষ (পলাস)
অশ্বত্থ

শমী বৃক্ষ
পিপ্পলী
ভরণী বৃক্ষ
অজশৃঙ্গী
(জল সংযুক্ত যব)
চীপুদ্রু
স্রোতের জল
গুগ্‌গুলু

কপিত্থক	মুক্তা
মলম	স্বর্ণ
অরুন্ধতী (লাক্ষা)	সীসক
অপামার্গ	হরিণের শৃঙ্গ
নিতত্নী	জালস্ (গোমূত্র)
	মধু

উপরি উল্লিখিত ভেষজ ভিন্ন অথর্ব্ববেদে আরও অনেক বৃক্ষলতাদির উল্লেখ আছে। ইহার কোনটী স্ত্রী বা পুরুষের ভালবাসালাভের জন্য, শত্রুনাশ করিবার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য আরাধিত হইয়াছে। অপর অনেকগুলির কেবল উল্লেখ আছে মাত্র।

কাহারও কাহারও মতে ঋগ্বেদ আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল। চ্যবনব্যূহে আয়ুর্ব্বেদকে ঋগ্বেদের উপবেদ বলা হইয়াছে—"সর্ব্বেষামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি। ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদঃ উপবেদঃ অথর্ব্ববেদস্য শাস্ত্রশস্ত্রাণি"। বাস্তবিক ঋগ্বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতি যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, তাহাতে তাৎকালিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতক কতক জ্ঞান দৃষ্ট হয়; কিন্তু অথর্ব্ববেদেই ঐরূপ জ্ঞান বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চরক সত্যই বলিয়া গিয়াছেন যে চতুর্ব্বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি স্থল—"চতুর্ণামৃক্‌সামযজুরথর্ব্ববেদানাম্ আত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদো হ্যথর্ব্বণঃ স্বস্ত্যয়নবলিমঙ্গলহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদি পরিগ্রহাৎ চিকিৎসাং প্রাহ"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আয়ুর্ব্বেদ ও গ্রীক এবং আরবীয়গণের চিকিৎসাবিজ্ঞান।

অথর্ব্ববেদের কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের সহিত ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশ দুইটি উপলক্ষ্য ধরিয়া হইয়াছে। প্রথম সীসক, লৌহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টা, দ্বিতীয়, সর্ব্বরোগহর জীবনীশক্তি বর্দ্ধনকারী ঔষধের (elixir of life) আবিষ্কার। ভারতেও এই দুইটি উপলক্ষ্য ধরিয়াই রসায়ন শাস্ত্র পুষ্টিলাভ করিয়াছে সত্য—কিন্তু প্রধানতঃ আয়ুর্ব্বেদকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াই উহা উন্নত হইয়াছিল। সেই জন্য দেখিতে পাই যে আয়ুর্ব্বেদের যত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, রসায়ন শাস্ত্রও ততই উন্নত হইয়াছে। অতএব রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া উঠিবে।

আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি এই যে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ (এবং রসায়ন শাস্ত্র) গ্রীক, রোমীয় বা প্রাচীন আরব জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কি না, এবং তাহা না হইলে প্রাচীন গ্রীক, রোমীয় বা আরব জাতির চিকিৎসা শাস্ত্র ভারতের আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণগ্রস্ত কি না? এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। ইউরোপে একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীক

দেশে। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন যে হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের বাক্যের মূল্য কতটা একবার আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন বৈদিক যুগে উহার উৎপত্তি। সত্যই ব্লুমফিল্ড সাহেব বলিয়াছেন "অথর্ব্ববেদের মন্ত্রগুলি ও তৎসংযুক্ত প্রক্রিয়া-সকল যেরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে, সেরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান জগতের কোন জাতির প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে দৃষ্ট হয় না।

তাহার পর আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের সময়ে সিকান্দারের ভারত-আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষ প্রাচীন গ্রীক, রোমীয় ও পরবর্ত্তী আরবীয়গণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সিকান্দারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বেও প্রাচীন ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। সেই সময়কার বিভিন্ন জাতির ভাব বিনিময়ে কোন জাতি বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন তাহার কতক কতক আভাস অনেক অনুসন্ধানের পর ক্রমে জানা যাইতেছে। আমরা প্রথমে গ্রীক ও রোমীয়-গণের এবং পরে আরবীয়গণের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদ ও গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের বহুল গবেষণার ফলে এ সম্বন্ধে, নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রথম। আয়ুর্ব্বেদ ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে এবং এই সৌসাদৃশ্যের জন্য গ্রীকগণই ভারতের আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী।

দ্বিতীয়। প্রাচীন গ্রীকগণের অনেক বিষয়ে শিক্ষাদাতা মিশরবাসি-

গণ। এই মিশরদেশ প্রাচীনযুগে ভারতীয় আর্য্যগণের উপনিবেশ ছিল। অতএব মিসরবাসিগণের ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা লাভ করাই স্বাভাবিক।

তৃতীয়। গ্রীক ভেষজ নির্ঘণ্টুতে নানাবিধ ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ ও গুণবর্ণনা আছে।

চতুর্থ। পরবর্ত্তী কালে (অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে) চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল বোগদাদের বাদসাহগণের অনুজ্ঞায় আরবী-ভাষায় অনুবাদিত হয়। পরে এই সকল আরবী অনুবাদ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকল ল্যাটিন ভাষায় পুনরনুবাদিত হয়। এই ল্যাটিন অনুবাদগুলি সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থল হইয়াছিল।

আমরা এই কয়েকটি সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে গণ্ডালের ঠাকুর সাহেবর লিখিত A short History of Indian Medical Science আমাদের প্রধান অবলম্বন।

প্রথম। আয়ুর্ব্বেদ ও গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সৌসাদৃশ্য ও তাহার জন্য গ্রীকগণই আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী—এই সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখত প্রমাণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক এই এরিয়ান (aryan) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে সর্পবিষের চিকিৎসা গ্রীকচিকিৎসকগণ জানিতেন না এবং পাঞ্জাবে অবস্থিতি কালে সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের চিকিৎসা সম্রাট আলেকজাণ্ডার হিন্দু বৈদ্যগণের দ্বারা সম্পন্ন করাইতেন। খুব সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডার তাঁহার সহিত কয়েকজন বৈদ্য লইয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক এবং হিন্দু চিকিৎসা প্রণালীর উৎপত্তির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন স্বর্গীয় বৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগল ছিলেন, গ্রীকগণের মধ্যেও সেইরূপ এপলো এবং আরটিমিস নামক যুগল স্বর্গীয় বৈদ্য কল্পিত

হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে হিপোক্রেটস (Hippocrates) নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের (Pythagoros) চিকিৎসা প্রণালীর সহিত ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। ইনি মিশরবাসিগণের নিকট তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই মিশরবাসিগণ আর্য্যগণের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস্। প্লেটো (Plato) এবং হিপোক্রেটস উভয়ে বায়ু, পিত্ত, কফ ও জল শরীরের এই চারি ধাতুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে ত্রিধাতুর (বায়ু, পিত্ত, কফ) উল্লেখ (১, ৩৪, ৫) থাকাতে হিন্দুগণের শরীরস্থ ধাতুসম্বন্ধে জ্ঞান প্রাচীনতর সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক গেলেন (Galen) তাঁহার শীত ও উষ্ণ ঔষধ সম্বন্ধে জ্ঞান নিশ্চয়ই ভারত হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর এইরূপ বহুবিধ সৌসাদৃশ্য আছে। হিন্দুরা যে গ্রীকগণের অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি এবং তাহারা অপরের নিকট গ্রহণ করিতে স্বতই পরাঙ্মুখ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অধ্যাপক ওয়েবার (Weber) তাঁহার History of Indian Literature এ লিখিয়া গিয়াছেন যে সুশ্রুত গ্রীকগণের চিকিৎসার নিকট ঋণী হইতে পারে না, পরন্তু বিপরীত মতই সঠিক বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে বিদেশীয় পারিভাষিক শব্দ নাই। ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার হার্সবার্গ (Hirschberg) বলিয়া গিয়াছেন যে হিন্দুদের কঠিন কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা গ্রীকগণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এবং ইউরোপীয়গণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সকল অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডায়াজও (Dias) অনেক গবেষণা করিয়া স্থির

করিয়াছেন যে গ্রীক চিকিৎসাপ্রণালী হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। যাঁহারা গ্রীকগণের পক্ষাবলম্বী তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে গ্রীকগণ তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য মিশরবাসিগণের নিকট ঋণগ্রস্ত এবং নিম্নে সপ্রমাণিত হইতেছে যে মিশর প্রাচীনযুগে ভারতীয় আর্য্যগণের উপনিবেশ ছিল।

দ্বিতীয়। মিশরদেশ (Egypt) যে এককালে আর্য্যদের উপনিবেশ ছিল তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব লিখিয়াছেন —"The Aryans believe Egypt (Misra) to have been colonised by the Indians. Proofs are given in support of the belief, which is beside our purpose to dilate upon here. Suffice it to say that the Tantrik deity *Nila-Shikhandi* (black-crested), an incarnation of Rudra, is recorded to have first taught the Niltantra (a mystical religious doctrine known to the Indians) in Egypt, the river Nile probably deriving its name from him. It is also stated that "in the reign of Vishvamitra, a certain king named Manuvina, being excommunicated by Brahmans emigrated with all his companions, passing through Arya (Iran or Persia . Baria (Arabia) and Misra (Egypt)." According to the Mahabharat the four sons of Yayati, who were cursed by their father, migrated to the West, and became ancestors of some of the Mlechha tribes and the name Misra (mixed) probably owes its origin to this circumstance. Sir William Jones in the *Reports*

of the Royal Asiatic Society is led to believe that Egypt must have been in remote ages colonised by the Indian Aryans; and writers like Major Wilford consider the Mishra-sthan" of the Purans to be no other than "Mishra," the ancient name of Egypt. There is, on the other hand, no record of the Egyptians having ever migrated into India. Such circumstantial evidence has led some European writers—Louis Jacolliot among others—to affirm that if Egypt gave civilisation to Greece and the latter bequeathed it to Rome, ;Egypt herself received her laws, arts and sciences from India. There is nothing in the Egyptian medicine which is not in the Indian system and there is much in the elaborate Indian system that is wanting in the medical science of Egypt."

তৃতীয়। গ্রীক ভেষজ নির্ঘণ্টু সকলে অনেক ভারতীয় ভেষজের নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ আছে। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিপোক্রেটস (Hippocrates) তাঁহার ভেষজ নির্ঘণ্টুতে তিল, জটামাংসী, কুন্দুরু, শৃঙ্গবের, মরীচ প্রভৃতি ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট পরে প্রথম শতাব্দীতে ডাইওস্কোরাইডস্ (Dioscorides) অনেক ভারতীয় ভেষজের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ভেষজ নির্ঘণ্টুতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ঘণ্টু বহুকাল ইউরোপে প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গেলেন (Galen) তাঁহার শীত ও উষ্ণ ঔষধ সম্বন্ধে জ্ঞান ভারত হইতে লাভ করিয়াছেন। মেসেপোটেমিয়ার বিখ্যাত স্ত্রীচিকিৎসাবিশারদ ইটিয়াস (Ætius) (খ্রীষ্ট পরে পঞ্চম শতাব্দী)

চন্দন, নারিকেল প্রভৃতি ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে পলস ইজিনেটা (Paulus Agineta) তাঁহার গ্রীকগ্রন্থে অনেকগুলি ভারতীয় ভেষজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ। অষ্টম শতাব্দী ও তাহার পর ভারতীয় বৈদ্যগণ বোগদাদের বাদসাহের চিকিৎসক ছিলেন এবং অনেক সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। এইরূপে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ আরবী ভাষায় স্থান পায়। পুনরায় এই সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষা হইতে ল্যাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল এবং এই সকল অনুবাদ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থল হইয়াছিল। সুশ্রুত হেপলরের (Hepler) দ্বারা ল্যাটিন ভাষায় এবং বুলার্সের (Vullers) দ্বারা জার্ম্মাণভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। চরকের নাম এভিসেনা (Avicenna), রাজেস (Razes), সেরাপিয়ন (Serapion) প্রভৃতি আরবীয় চিকিৎসক ও রাসায়নিকগণের গ্রন্থাবলীর ল্যাটিন অনুবাদ সকলে ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে।

পঞ্চম। ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ সম্বন্ধে গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। ইউরোপে প্যারাসেলসস্ (Paracelsus) পারদ প্রভৃতি ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রথার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে চক্রপাণি কজ্জলি সেবনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্যারাসেল্সস্ পারদ সেবনের জ্ঞান ভারত হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের যোগীদিগের দীর্ঘ আয়ু সম্বন্ধে প্রবাদ তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে গ্রীক্‌দেশে পঁহুছিয়াছিল। মার্কো পোলো (Marco polo) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতের যোগীরা পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া মাসে দুইবার সেবন করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন—

"these (the Yogis of India) are extremely long-lived, every man of them living to 150 or 200 years. They eat very little rice and milk chiefly. And these people make use of a very strange beverage. a portion of sulphur and quicksilver mixed together, and this, they say, they drink twice every month. This, they say, gives them long life." * প্যারাসেল্‌সস্ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্যই বিখ্যাত গ্রীক্ পর্য্যটক মার্কো পোলোর গ্রন্থ হইতে ভারতের যোগিগণের কজ্জলী সেবনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান।

সর্ব্বশেষে আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত ভারতের আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ আলোচনা করা যাইতেছে। মহম্মদের আবির্ভাবের পর আরব-দেশবাসিগণ এক নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবীন উৎসাহে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এসিয়া খণ্ডে পারস্য দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আফ্রিকার উত্তর খণ্ড, ইউরোপের দক্ষিণপ্রদেশের যাবতীয় দেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ার পর মধ্যযুগে পশ্চিম এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপখণ্ডে এই আরবীয়গণই জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন। বোগদাদ, আলেকজাণ্ড্রিয়া, কর্ডোভা প্রভৃতি নগরের মুসলমানগণের দ্বারা স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ সমবেত হইতেন। এই আরবীয়গণ একদিকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণের এবং অপরদিকে প্রাচীন ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র

Colonel Yule s Marco polo, vol, II. p. 300.

প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার অনুশীলন, সমন্বয় ও উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের মুসলমানগণের মধ্যে গেবার (Geber) এভিসেনা (Avicenna), সিরাপিয়ান (Serapion), রাসেস (Rases), বুবাকর (Bubacar) প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মুসো বার্থেলো (M. Berthelot) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে গেবার প্রমুখ আরবীয় রাসায়নিকগণ তাঁহাদের গবেষণার জন্য প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ইঁহারা যে প্রাচীন ভারতের নিকটেও বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন, সে সংবাদও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রকাশিত হইতেছে।

আরবীয়গণ তাঁহাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী, তাহা সপ্রমাণ করিবার পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরবীয়গণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত এবং দক্ষিণভারত হইতে তাহারা নানাবিধ ভেষজ, গন্ধদ্রব্য, মসলা প্রভৃতি দ্রব্য আফ্রিকা ও ইউরোপে রপ্তানি করিত। এইরূপে ভারতীয় ভেষজের গুণাবলী আরবীয়গণ অবগত হয়েন। উসেবিয়া (Usebiah) প্রভৃতি আরবীয় ভেষজনির্ঘণ্টুতে ভারতের যষ্টিমধু, লাক্ষা, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, ত্রিফলা, রক্তচন্দন, আদ্রক প্রভৃতি ভেষজ স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়। অষ্টম শতাব্দীতে আধুনিক সিণ্ড (Sindh) প্রদেশ বোগদাদের বাদসাহ খালিফ মনসুরের অধীনস্থ হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বাদসাহের দরবারে ভারত হইতে অনেক পণ্ডিত যাইতেন। এইরূপে আরবীয়গণ ভারতের উন্নত দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হন। আব্বাস বংশীয় মনসুর ও হারুণ প্রভৃতি

বাদসাহগণ যাবতীয় বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, চরক, সুশ্রুত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী-ভাষায় অনুবাদিত হয়। কিতাব আলফিরিষ্ট নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে মাঙ্ক নামক একজন ভারতবাসী সুশ্রুত আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি বাদসাহ হারুণ আল রসিদের কোন দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন এবং বোগদাদের রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। সুশ্রুতের আরবীয় সংস্করণের নাম ছিল কিলাল-সশুর-আল-হিন্দি। আলি ইবন জৈন নামক জনৈক মুসলমান আরবীভাষায় চরকের একজন অনুবাদক। বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত মুলার আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে চরক সুশ্রুত ভিন্ন মাধবকরের নিদান ও বাগভটের অষ্টাঙ্গ এবং আরও কয়েকখানি সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। মুলার সাহেব আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়িগণ বোগদাদে রাজকীয় চিকিৎসকও ছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থাবলী কেবল আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল এমন নহে, অনেকগুলি তাহার পূর্ব্বে ফার্সীতে অনুবাদিত হইয়াছিল এবং পরে এই ফার্সী অনুবাদ হইতে এই সকল গ্রন্থ আরবী ভাষায় পুনরনুবাদিত হয়।

তৃতীয়। ভারতের সহিত আরবীয়গণের পরিচয় হইবার পর অনেক মুসলমান পণ্ডিত ভারতে শিক্ষা করিতে আসিতেন। যাঁহারা আলবেরুনি কৃত "ভারতবর্ষ" পড়িয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। যখন মামুদ গজনবি ভারত আক্রমণ করিতে আইসেন তখন প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতিষী আলবেরুনি তাঁহার সঙ্গে ভারতে আসিয়া তের বৎসর ধরিয়া হিন্দু জ্যোতিষ ও দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সবিশেষ অভিজ্ঞ

ছিলেন এবং তাঁহার পুস্তকপাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে কেমন করিয়া আরবীয়গণ একদিকে গ্রীকগণের ও অপরদিকে হিন্দুদিগের শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতেন। ভারতের আয়ুর্ব্বেদও এইরূপে অনেক আরবীয় পণ্ডিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থসমূহে 'সরক' (চরক), সুশ্রুদ (সুশ্রুত) ('বদান')'(নিদান)' 'অসঙ্কর' (অষ্টাঙ্কর, অষ্টাঙ্গ) প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহের উল্লেখ বহুস্থানে আছে।

চতুর্থ। পরবর্ত্তী তান্ত্রিকযুগে যখন ধাতু ঘটিত ঔষধ সকল বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত হইত তখন পর্য্যন্ত ইউনানি হাকিমেরা ধাতু ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিতে ভীত হইতেন। ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত

* গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন "It requires no great effort to prove that India has contributed greatly to the Arabic System of medicine. The Arabian Physician Serapion (Ibu Serabi) in his well-known treatise upon medicine often quotes Charaka, who is named "Sharaka Indianus "in the Latin translation Avicenna, better known by the name of Aflatoon in India—the. name has become synonymous with a "learned man" among the Hindus—flourished in the ninth century and was the most celebrated physician of Bokhara. While describing the Indian preparation of trifala (the three myrobalans) in his work, he quotes the opinion of Charaka and other writers with great respect. Another Physician Razes (Al Rasi) who is said to have lived long before the two preceding physicians, in treating of the properties of dry ginger and other drugs transcribes passages from the work of an Indian writer whom he calls "Sindhi-chara." This "Sindhi-chara" appears to be no other than the celebrated Vagbhata of Sindh, who was in his time known as a second Charaka or Chara—the syllable "Ka" making no difference, as in words like "bala" and "balaka," both meaning a child."

যে হিন্দুরা সর্ব্ব প্রথমে পারদ ঘটিত ঔষধের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন। প্লথোয়ার কৃত "তালিফ সরিফ" নামক গ্রন্থের অনুবাদ পাঠে জানা যায় যে যখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অবাধে হরিতালভস্ম, পারদ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই সময় হাকিমেরা সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করিতে: সাহস করিতেন না। * আয়ুর্ব্বেদের স্বকৃত ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ইহার পর কাহারও অবিশ্বাস থাকিতে পারে না।

মুসলমানগণের ভারত অধিকার করিবার পর আয়ুর্ব্বেদ বিদেশীয়গণের নিকট হইতে কোন কোন বিষয়ে ঋণলাভ করিয়াছে। শার্ঙ্গধর, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি ষোড়শ শতাব্দীর গ্রন্থ সমূহে মুসলমান ও পর্ত্তুগিজগণের প্রভাব স্পষ্ট হয়। অহিফেন, সুলেমানি খর্জ্জুর প্রভৃতি বিদেশীয় দ্রব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ফিরঙ্গরোগ পর্ত্তুগিজগণ এদেশে আনয়ন করেন। ভাবপ্রকাশ ফিরঙ্গরোগের নিদান ও চিকিৎসা খুব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যপ্রথা মতে ফিরঙ্গরোগে রসকর্পূর (Calomel) ও চোবচিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

---

* George Playfir's Taleef Shareef—pp. 26 99, 146.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ ও রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কাল স্থূলত তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১) বৈদিক যুগ, (২) আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ, (৩) তান্ত্রিক যুগ। অতি সংক্ষেপে এই তিনটী যুগ আলোচিত হইবে।

বৈদিক যুগ।

এই যুগের প্রধান গ্রন্থ অথর্ব্ববেদ ও কৌশিক সূত্র। এই গ্রন্থদ্বয় প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। এই যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ত্রপু ও সীস এই ছয় ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল ("ধাতুবর্গ" দ্রষ্টব্য)। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীস ধাতু রোগবিনাশকল্পে "পরিহস্ত" রূপে ব্যবহৃত হইত।

আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ।

অথর্ব্ববেদের পর ও চরক এবং সুশ্রুতের মধ্যে অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল ইহা সুনিশ্চিত। "ব্রহ্মসংহিতা," "অশ্বিনীকুমার সংহিতা" ও "আত্রেয় সংহিতা" এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত কৃত সংহিতাসকল চরকের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। চরকসংহিতা অগ্নিবেশকৃত সংহিতার সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক রচিত হইয়াছে। চকরসংহিতা ভিন্ন অপর সংহিতাগুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সকল সংহিতার উল্লেখ বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বহুলপরিমাণে দৃষ্ট

হয়। প্রবাদপ্র সদ্ধ প্রাচীন অষ্টভা গ বিভক্ত আয়ুর্ব্বেদসংহিতা যে কাল্পনিক নহে তাহাব প্রমাণ এই যে উহার "রসায়ন" ভাগ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিকানের ক্যাটালগে এখনও রহিয়াছে। একখানি ভেলসংহিতাব বিবরণ ডাঃ বার্ণেলের টাঞ্জোর ক্যাটালগে দৃষ্ট হয়। অধুনা একখানি হারীত সংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু উহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক এবং উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাগভট অগ্নিবেশ, হারীত ও ভেলসংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার সময়ে নিশ্চয়ই ঐ তিনখানি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এই আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে পাণিনিতে "আয়ুর্ব্বেদ," আয়ুর্ব্বেদিক" ও নানাপ্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়। * পাণিনি গোল্ডষ্টুকার (Goldstucker) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

চরকের সংক্ষিপ্ত কাল নিরূপণ।

চরকের কালনির্ণয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হইয়াছে। অধুনা আমরা চরকসংহিতা বলিয়া যাহা পাঠ করিয়া থাকি, তাহার সকল অংশই যে চরকপ্রণীত তাহা নহে। আধুনিক চরকসংহিতায় দেখিতে পাই

অথণ্ডার্থং দৃঢ়বলোজাতঃ পঞ্চনদে পুরে।
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্চ বলোচ্চয়ম্।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ॥ সিদ্ধিস্থান, ১২ অধ্যায়।

পঞ্চনদ নিবাসী দৃঢ়বল খণ্ডিত চরকের সপ্তদশ ঔষধাধ্যায়, সমস্ত সিদ্ধি ও কল্পস্থান নানা তন্ত্র হইতে সারসঙ্কলনপূর্ব্বক সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। অতএব আধুনিক চরকসংহিতার চিকিৎসাস্থানের সপ্তদশ

* Ray: History of Hindu Chemistry Vol. I p. XXII.

অধ্যায়, সিদ্ধিস্থানের দ্বাদশ অধ্যায় ও কল্পস্থানের দ্বাদশ অধ্যায় সর্ব্বসমেত শেষ ৪১ অধ্যায় চরক রচিত নহে, দৃঢ়বল কর্ত্তৃক সংযোজিত। অতএব চরকের কাল নির্ণয় করিতে হইলে দুইটি কাল নির্ণয়ের প্রয়োজন,একটি—চরকের ও অপরটি দৃঢ়বলের।

চরক যে অতি প্রাচীনকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার দুইটি বেশ সুন্দর প্রমাণ রহিয়াছে। পাণিনির সময় নিশ্চয়ই যে চরকের চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা "কটচরকাল্লুক্" এই সূত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে চরকের একজন প্রতিসংস্কর্ত্তা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।* চক্রপাণি তাঁহার চরক-টীকায় লিখিয়াছেন —

পাতঞ্জল মহাভাষ্য চরক প্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্‌কায়দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥

পুনরায় নাগেশ ভট্টকৃত লঘুমঞ্জুষাতেও পতঞ্জলি চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে "আপ্তো নাম অনুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্নেন নিশ্চয়বান্, রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ সঃ ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ।" মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে বৈদ্যকেও পারদর্শী ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ আছে। শিবদাস তাঁহার চক্রপাণিকৃত টীকায় পতঞ্জলিকে "লোহশাস্ত্র" নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভোজ তাঁহার "ন্যায়বার্ত্তিকে" লিখিয়াছেন—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥

পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে "রসায়ন" মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া

* Ray : Ibid, p. X, LV.

স্বীকৃত হইয়াছে। আলবেরুণি তাঁহার "ভারতবর্ষ" নামক গ্রন্থে লিখিয়া-গিয়াছেন "(The author Patanjali) adds to the three parts of the path of liberation a fourth one of an illusory nature, called *Rashyana*, consisting of alchemistic tricks with various drugs intended to realise things which by nature are impossible."

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভাণ্ডার্কারের (Dr. Bhandarkar) মতে পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রতিসংস্কর্ত্তার অন্ততঃ দুই শতাব্দী আগে যে চরক তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। পাণিনির "কটচরকাল্লুক্" সূত্র ছাড়িয়া দিলেও চরকের আবির্ভাব কাল অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী ধরিয়া লইতে আমরা অনায়াসে পারি।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহা আধুনিক চরকসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা অগ্নিবেশকৃত সংহিতা। এই অগ্নিবেশ-কৃত সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক। চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা পতঞ্জলি এবং পূরক দৃঢ়বল। যে অংশ চরক ও পতঞ্জলির প্রতিসংস্কৃত সে অংশ খুব প্রাচীন এবং যে অংশ দৃঢ়বল কৃত সে অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা যে পতঞ্জলি এ মত বিশেষভাবে প্রচলিত না হইলেও ঐ বিষয়ে এত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৃঢ়বলের কাল সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

চরকে দেখিতে পাই যে যবক্ষার ও সর্জ্জীকাক্ষার এই দুই ক্ষার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পঞ্চ লবণ, মনঃশিলা, হরিতাল, কাশীস, রসাঞ্জন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসক প্রভৃতি ধাতু গালাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া যে মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতে

পারে তাহাও তৎকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। * অনেকের মত এই যে চরকে ধাতুর আভ্যন্তরিক ব্যবহার নাই। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায় যে কয়েকস্থলে তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর আভ্যন্তরিক ব্যবহার আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ হইল, বোধ হয় ভাল করিয়া অন্বেষণ করিলে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত মিলিতে পারে। লৌহের ব্যবহার—"পুনর্ণবায়োরজনীশ্বদংষ্ট্রাফল্গুপ্রবালাশ্চ সদর্ভপুষ্পাঃ ইত্যাদি" †। এখানে লৌহ ও প্রবাল অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সেবন করিলে অশ্মরী ও শর্করা নষ্ট হয়। বঙ্গবাসীর চরকের অনুবাদে এখানে লৌহভস্ম ও প্রবাল-ভস্ম লৌহ ও প্রবালের পরিবর্ত্তে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের ব্যবহার—বিষচিকিৎসায় সূক্ষ্ম তাম্রচূর্ণ সেবন করাইয়া প্রথমে বমন করাইয়া পরে স্বর্ণ সেবন করাইবার ব্যবস্থা আছে।

জগ্ধমিত্যবগম্যাশু প্রদদ্যাদ্বমনং ভিষক্।
সূক্ষ্মতাম্ররজস্তস্মৈ সক্ষৌদ্রং হৃদ্বিশোধনম্॥
শুদ্ধে হৃদি ততঃ শাণং হেমচূর্ণস্য দাপয়েৎ।
হেম সর্ব্ববিষাণ্যাশু গরাংশ্চ বিনিযচ্ছতি।
হেমপস্য সজত্যাঙ্গ নহি পদ্মহস্তুবদ্বিষম্॥ ‡

এই দুইটি শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে মারিত তাম্রের প্রচলন হয় নাই, "সূক্ষ্মতাম্ররজের"ই প্রচলন ছিল। কিন্তু "মুক্তাস্য

* "তদ্‌যথা—কনকরজততাম্রত্রপুসীস আসিচ্যমানাস্তেষু তেষু মধূচ্ছিষ্টবিম্বেষু তে যদ মনুষ্যবিম্বমাপদ্যন্তে তদা মনুষ্যবিগ্রহেণ জায়ন্তে"—চরক, শারীরস্থান ৩য় অধ্যায় ২৬।

† চরক, চিকিৎসিতস্থান, ২৬ অধ্যায়, ৫৬।

‡ চরক, চিকিৎসিত স্থান, ২৫ অধ্যায়, ১৮৬,১৮৭।

চূর্ণের” উপাদানসমূহের মধ্যে তাম্র, লৌহ, রৌপ্যের সহিত গন্ধক একত্র করিয়া মাড়িয়া লেহন করিবার ব্যবস্থা আছে।

মুক্তাপ্রবালবৈদূর্য্যশঙ্খস্ফটিকমঞ্জনম্।
সসারগন্ধকাচাকসূক্ষ্মৈলালবণদ্বয়ম্ ॥
তাম্রায়োরজসী রূপ্যং সসৌগন্ধিকমেব বা।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ লীঢ়ামাশু নিযচ্ছতি ॥ *

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তৎকালে প্রত্যেক ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন মারণ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত না হইলেও ঔষধের মধ্যে মারিত ধাতু লেখকের অজ্ঞাতসারে থাকিয়া গিয়াছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, যদি চিকিৎসাস্থানের এই সকল অধ্যায় দৃঢ়বলের দ্বারা লিখিত হয়, তাহা হইলে উহা চরক অপেক্ষা আধুনিক হইয়া পড়িবে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে দৃঢ়বল বাগভটের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া ছলেন।

সুশ্রুতের সংক্ষিপ্ত কালনিরূপণ।

চরকের ন্যায় সুশ্রুত একখানি অতিপ্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ। সুশ্রুতের কালনিরূপণের উপাদান অতি অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন প্রাচীন চরক যথাক্রমে পতঞ্জলি ও দৃঢ়বল কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন সুশ্রুত নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়াছিল। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বন লিখিয়া গিয়াছেন “প্রতিসংস্কর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব।” নাগার্জ্জুন কেবল প্রতিসংস্কর্ত্তা নহেন পূরকও বটে। তিনি উত্তরতন্ত্র সুশ্রুতে যোগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব সুশ্রুতের কালনিরূপণ করিতে হইলে দুইটি পৃথক্ কাল নিরূপণ করিতে হইবে—প্রাচীন সুশ্রুতের ও নাগার্জ্জুনের।

* চরক চিকিৎসিত স্থান, ২১ অধ্যায়, ৬৯।

প্রাচীন সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে অধিক জানা নাই। তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র, কাশীরাজ দিবোদাসের নিকট শল্যবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে "সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং" পদ সাধিত হইয়াছে। এই সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদকার সুশ্রুত বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। রিস্ ডেভিস, (Rhys Davis) ওয়েবার (Weber) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে কাত্যায়ন বার্ত্তিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। অতএব প্রাচীন সুশ্রুত খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রাচীন সুশ্রুতের কালনিরূপণের অন্যবিধ প্রমাণ নাই। তবে সুশ্রুত যে অতি প্রাচীন তাহা নব আবিষ্কৃত বাওয়ার পাণ্ডুলিপি (Bower manuscripts) হইতে বেশ বুঝা যায়। এই পাণ্ডুলিপি ডাক্তার হর্ণেল ও অধ্যাপক ব্রুলের মতে খ্রীষ্ট পরে চতুর্থ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উহা সুশ্রুত কর্তৃক লিখিত এবং কাশীরাজ কর্তৃক উপদিষ্ট বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। উহা পাঠে জানা যায় যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুশ্রুত অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে সুশ্রুত চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের অনেক শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সুশ্রুতপাঠে ভারতের অতীত গৌরবের দিনে শল্যবিদ্যা ও শরীরবিদ্যার অভিজ্ঞতা দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। রাসায়নিকের চক্ষে সুশ্রুত কম আদরের বস্তু নহে। সুশ্রুতোক্ত মৃদু, মধ্যম, ও তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রক্রিয়ার বর্ণনা এমন কি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। সুশ্রুতে ধাতুর অয়স্কৃতিবিধি তান্ত্রিক যুগের ধাতুর জারণ মারণের সূচনা করিয়া দিয়াছে।

সুশ্রুতে লৌহের অয়স্কৃতি-প্রক্রিয়া নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত আছে—
"কান্তলৌহের অতি সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণবর্গের প্রলেপ

দিবে; পরে সেই লবণলিপ্ত লৌহপাত গোময়াগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলা ও সালসারাদিগণের কাথ দ্বারা নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপে ষোলবার দগ্ধ ও নির্ব্বাপিত করার পরে পুনর্ব্বার তাহা খদিরকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। শীতল হইলে সেই লৌহ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ঘন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই লৌহচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। এইরূপে অন্যান্য লৌহের অর্থাৎ বঙ্গ, সীস, তাম্র, রৌপ্য ও সুবর্ণের অয়স্কৃতিপ্রয়োগ করিতে পারা যায়।"* এই উপায়ে ধাতুর অক্সাইড বা ক্লোরাইড প্রস্তুত হইবে। এখন কথা হইতেছে যে এই অয়স্কৃতি-বিধি সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুশ্রুতের টীকাকার ডহ্বনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন কেবল প্রতিসংস্কর্ত্তা নহেন, তিনি উত্তরতন্ত্রের রচয়িতাও বটে। † তাহা হইলে এই অয়স্কৃতি নাগার্জ্জুনকৃত প্রক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। আমার ধারণা এই যে এই অয়স্কৃতি-বিধিই নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত ধাতুমারণপ্রক্রিয়া। নাগার্জ্জুনের পরবর্ত্তিকালে এই প্রক্রিয়ার বহু উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল পরিবর্ত্তিত প্রক্রিয়ার উপদেষ্টা নাগার্জ্জুন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এরূপ হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে। কোন গ্রন্থ বা প্রক্রিয়া লোকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির নামের সহিত জড়িত করিয়া দেওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাচীনকালের সাহিত্যে পাওয়া যায়। চতুর্ব্বেদবিভাগ, মহাভারত রচনা, অষ্টাদশ পুরাণ রচনা একা ব্যাসদেবই করিয়া গিয়াছেন বলিয়া অনেকেরই মত।

* সুশ্রুতসংহিতা, উত্তরতন্ত্র, অয়স্কৃতিবিধি।

† বৈদ্যকশব্দসিন্ধু, ।৵০ পৃঃ।

বাগভট।

চরক, সুশ্রুতের ন্যায় বাগভটও একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকার। বাগভটের অষ্টাঙ্গ চরক ও সুশ্রুতের সারভাগ লইয়া রচিত। বাগভটের রসায়নজ্ঞান চরক ও সুশ্রুতের অপেক্ষা উন্নত নহে তির্য্যক্‌পাতন, অধঃপাতন বা ঊর্দ্ধপাতন এবং ধাতুর শোধন বা মারণ প্রক্রিয়া অষ্টাঙ্গে দৃষ্ট হয় না। তবে লবণ, যবক্ষার, খনিজ ধাতু প্রভৃতি ধাতুঘটিত ঔষধের অপেক্ষাকৃত প্রাবল্য দেখা যায়। বাগভটেও সুশ্রুতের ন্যায় মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রক্রিয়া বিশদভাবে বর্ণিত আছে। *

ডাক্তার রায় বাগভটের আনুমানিক কাল পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ আনুমানিককাল যে কতকটা নির্ণয় করা না যায় এমন বোধ হয় না। বাগভট যে বৌদ্ধ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার অষ্টাঙ্গহৃদয় ও অষ্টাঙ্গসংগ্রহে বুদ্ধ, অর্হৎ, তথাগতের প্রতি নমস্কার আছে। বাগভট অষ্টাঙ্গহৃদয়ের শেষভাগে লিখিয়াছেন —

ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরক-সুশ্রুতৌ।
ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥

এই শ্লোকের টীকায় অরুণদত্ত লিখিয়াছেন "তস্মাৎ স্থিতমেতৎ সুভাষিতং গ্রাহ্যং নতু মুনিপ্রণীতমেব তন্ত্রম্। অতঃ চরকসুশ্রুতবৎ অনার্ষমপীদং গুণবত্ত্বাৎ মতিমদ্ভির্গ্রাহ্যমেব"। কথা হইতেছে বাগভট চরক সুশ্রুতকে অনার্ষ বলিলেন কেন? ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাগভট দৃঢ়বল কর্ত্তৃক পূরিত চরক ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত ও পূরিত সুশ্রুতকেই অনার্ষ বলিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে আদি চরক ও সুশ্রুতকে অনার্ষ বলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। অতএব দৃঢ়বল ও নাগার্জ্জুন উভয়েই বাগভটের পূর্ব্ববর্ত্তী। দৃঢ়বল যে বাগভটের

* বাগভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় (বিনোদলাল সেন গুপ্তের সংস্করণ)—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৮৬পৃ,

পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার আরও প্রমাণ এই যে বাগভট চরকের দৃঢ়বল কর্ত্তৃক পূরিত কল্প ও সিদ্ধিস্থান হইতে অনেক পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন যে বাগভটের পূর্ব্ব সুশ্রুতসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন তাহার আরও প্রমাণ এই যে বাগভট আধুনিক সুশ্রুতসংহিতা বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা হইতেই অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের পরে সুশ্রুতের পাঠ খুব সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সুশ্রুতের টীকাকার ডহনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন কেবল সুশ্রুতের প্রতিসংস্কারক নহেন, তিনি উত্তরতন্ত্র উহাতে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই উত্তরতন্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তিত আকারে বাগভটে দৃষ্ট হয়। সুতরাং নাগার্জ্জুন যে বাগভটের পূর্ব্ব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ খুব কম। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে নাগার্জ্জুন খ্রীষ্ট পরে দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবেই দেখা গেল যে বাগভট দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক কোন্ শতাব্দীর আগে তাঁহার রচিত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে সপ্রমাণিত হইবে যে তাঁহার গ্রন্থসকল খ্রীষ্টপরে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। প্রথমেই দেখা যায় যে চরক, সুশ্রুত ও বাগভট অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বাদসাহদের অনুজ্ঞায় আরবীভাষায় অনুবাদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত তিব্বতীয় টাঞ্জোরে চরক সুশ্রুত ও বাগভটের অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ বিখ্যাত আরবীয় চিকিৎসক রাজেস (Rhazes) তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে ভারতের "সিন্ধিচর" নামক একজন আয়ুর্ব্বেদকারের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পাঠ অনুবাদ করিয়াছেন। এই "সিন্ধি-চর" বা "সিন্ধি-চরক" সিন্দুপ্রদেশনিবাসী বাগভট ভিন্ন

আর কেহ নহেন। * এই রাজেস ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। † অতএব বাগভট দশম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বাগভট দ্বিতীয় ও অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এখন ইহার মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। আমি তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপরে তৃতীয় শতাব্দী নির্দ্ধারণ করিলাম। তাহার কারণগুলি নিম্নে বিবৃত করিতেছি। প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে নাগার্জ্জুন বাগভটের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তান্ত্রিকগ্রন্থসমূহে নাগার্জ্জুন ধাতুর জারণ মারণ ও তির্য্যক্‌পাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। অথচ বাগভটে এ সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাই। সেইজন্য মনে হয় যে বাগভট নাগার্জ্জুনের পর একশত বৎসরের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই একশত বৎরের মধ্যে নাগার্জ্জুনের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াগুলি আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হয় নাই। তার পর আরবীয় চিকিৎসক রাজেসের (Rhazes) গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে দশম শতাব্দীতে বাগভট দ্বিতীয় চরক বলিয়া আদৃত হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ আর্ষ উপাধি লাভ দুই এক শতাব্দীতে সম্ভবে না। বাগভট তৃতীয় শতাব্দীর আয়ুর্ব্বেদকার হইলে রাজেসের পূর্ব্বে সাত শতাব্দী ব্যবধান পড়িল। উপরন্তু চরক ও সুশ্রুতের ন্যায় বাগভটও অষ্টম শতাব্দীতে আরবী ও তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে উহার প্রাচীনত্ব ঘোষিত হইয়াছে।

ডাক্তার কুণ্টি (Kunti) বাগভটকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফেলিতে চান। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য তাহা কোন ক্রমেই হইতে

* History of Aryan medical Science "by Thaker shaheb of gadal P. 195.

† Thorpe's History of chemistry, Vol. I. p 29.

পারে না। আবার অপর দিকে রাজতরঙ্গিণীর মতে বাগভট রাজা জয়সিংহের (১১৯৬-১২১৮ খ্রীঃ অঃ) সমসাময়িক করিয়াছেন। ডাক্তার রায় ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন—"This view is untenable, and it is one of the many instances which would go to prove that Kalhana in writing his chronicles had often draw largely upon vague traditions and hence his dates are to be accepted "cum grano salis." *আমার মনে হয় রাজতরঙ্গিণীর কথা একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে আরও একজন বাগভট আছেন—তিনি রসরত্নসমুচ্চয়কার। নিজেকে প্রাচীন বাগভট বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহাকে ভারি লালায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত বাগভট রাজতরঙ্গিণীর বাগভট হওয়াই সম্ভব; রসরত্নসমুচ্চয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত, অতএব তাহার রচয়িতা ঠিক রাজা জয়সিংহের সমকালীন হইয়া পড়েন।

দৃঢ়বল ও মাধবকর।

এই প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় যুগের আরও দুই জন আয়ুর্ব্বেদকারের কাল-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। চরকের পূরক দৃঢ়বল ও নিদানকার মাধবাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় যুগের অন্যতম লেখক। দৃঢ়বল যে বাগভটের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার সন্দেহ নাই, কারণ বাগভট দৃঢ়বল কর্ত্তৃক পূরিত চরকের কল্প ও সিদ্ধিস্থান হইতে অনেক পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে দৃঢ়বল নাগার্জ্জুন অপেক্ষা প্রাচীনতর কি না। কেহ কেহ

---

*. Ray: History of Hindu chemistry, Vol. I., p. XXVIII.

অশ্মরী চিকিৎসায় চরক ও সুশ্রুতের শস্ত্রোপচার সম্বন্ধে একটি শ্লোকের মিল দেখিয়া নাগার্জ্জুনকে দৃঢ়বলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। * কিন্তু চরক ও সুশ্রুতের অনেক স্থানে মিল আছে এবং এ সম্বন্ধে ডাক্তার রায় যাহা বলিয়াছেন আমিও সেই মতের পোষকতা করি—"That the reductor (Nagarjuna) thoroughly recast and remodelled the Suśruta is evident from the fact that there are numerous passages in it which agree almost verbatim with the Charaka, and which appears to have been amply laid under contribution"। † তাহা হইলে দৃঢ়বল নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই আমার ধারণা। নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইলে দৃঢ়বল খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী বা খ্রীষ্টপরে প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

রুগ্বিনিশ্চয় বা নিদানকার মাধব বাগভটের পরবর্ত্তী, কারণ নিদান চরক, সুশ্রুত ও বাগভটের সারসংগ্রহ করিয়া রচিত। নিদানে বাগভটের পাঠও যথেষ্ট উদ্ধৃত আছে। অপর দিকে অষ্টম শতাব্দীতে নিদানও চরক, সুশ্রুত ও বাগভটের সহিত বোগদাদের বাদসাহদিগের অনুজ্ঞায় আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। পরন্তু বৃন্দের সিদ্ধযোগ রুগ্বিনিশ্চয়োক্ত ব্যাধির নিদানের অনুযায়ী করিয়া লিখিত। বৃন্দের কাল নবম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (পরে দ্রষ্টব্য)। অতএব মাধব তৃতীয় শতাব্দী ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাকে পঞ্চম শতাব্দীর আয়ুর্ব্বেদকার করিলে বেশী ভ্রম হইবে না, কারণ চরক,

* বনৌষধিদর্পণ, প্রথম ভাগ, ৪৯ পৃঃ।

† Ray: History of Hindu chemistry Vol. I. p. XV.

সুশ্রুত ও বাগভটের সহিত নিদানও আরবী ভাষায় অনূদিত হওয়াতে উহার প্রাচীনত্ব ঘোষিত হইতেছে।

তান্ত্রিক-যুগ

নাগার্জ্জুন।

যেমন নব্যরসায়নের জন্মদাতা বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভো-য়াসিয়ে, সেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন রসায়নের জন্মদাতা বলিয়া যদি কোন একজনকে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে নাগার্জ্জুনকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বহুবিধ তান্ত্রিক গ্রন্থে নাগার্জ্জুন তির্য্যক্‌পাতন প্রক্রিয়া (distillation) এবং ধাতুর জারণ ও মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এখানে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। চক্রপাণি লৌহমারণ বর্ণনকালে উহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি "নাগার্জ্জুন বর্ত্তি" বর্ণনাকালে লিখিয়া গিয়াছেন "নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে"* ঐ বর্ত্তির একটি উপাদান মারিত তাম্র। রসেন্দ্রচিন্তামণি নাগার্জ্জুনকে তির্য্যক্‌পাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,— "তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ"। † ঐ গ্রন্থে লৌহমারণ নাগার্জ্জুনের আবিষ্কার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—"নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস যল্লৌহশাস্ত্রমতিগহনম্।" ‡ নিত্যনাথবিরচিত রসরত্নাকর নামক রসগ্রন্থে "ব্যাধিতানাং হিতার্থায় প্রোক্তং নাগার্জ্জুনেন হ" § এই শ্লোকে নাগার্জ্জুনকে

* চক্রদত্তসংগ্রহ—নাগার্জ্জুনবর্ত্তি।

† রসেন্দ্রচিন্তামণি—কালীশচন্দ্র সেনের সংস্করণ—পৃঃ ১১।

‡ ঐ ঐ — ৫৮।

§ রসরত্নাকর (বম্বে সংস্করণ)—পৃঃ ৪।

একজন রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয়, রসরাজলক্ষ্মী, রসকঙ্কশুদ্ধাকর প্রভৃতি যাবতীয় তান্ত্রিকগ্রন্থে নাগার্জ্জুন একজন প্রধান রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। নাগার্জ্জুন "রসরত্নাকর", আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই রাসায়নিক নাগার্জ্জুন এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা সিদ্ধ-নাগার্জ্জুন একই ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার ডহ্বনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্ত। মহযান-প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন যে একজন রাসায়নিক ও চিকিৎসাপারদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ, পালি, তিব্বতীয় ও চীনভাষায় লিখিত নানাগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত চীনপর্য্যটক হুয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতপর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া নাগার্জ্জুনকে একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ও রাসায়নিক বলিয়া শুনিয়া গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে নাগার্জ্জুনের চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শীতা সম্বন্ধে বিস্তর অতিমানুষিক কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বহু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহে নাগার্জ্জুন একই কালে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও রাসায়নিক বলিয়া বর্ণিত আছে।

নাগার্জ্জুনের আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ আছে। যে সকল প্রমাণের দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবকাল নিরূপিত হইতে পারে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।—

প্রথম। চীনপর্য্যটক হুয়েন সাং নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে নাগার্জ্জুনের জীবনী চীনভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল।

তৃতীয়। হর্ষচরিতকার বাণ নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের সমসাময়িক করিয়াছেন।

চতুর্থ। রাজতরঙ্গিণীর মতে নাগার্জ্জুন কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন।

পঞ্চম। ডাক্তার রায় নাগার্জ্জুনকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ রসরত্নাকর নামক গ্রন্থের যে অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে নাগার্জ্জুন, রাজা শালীবাহন, রত্নঘোষ ও মাণ্ডব্যের সহিত কথোপকথনচ্ছলে রসক্রিয়া বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ। মূল সংস্কৃত "সুহৃল্লেখা" নামক লুপ্ত পুস্তকের তিব্বতীয় ও চীনভাষার অনুবাদে নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের বন্ধু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম। প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতিষী এলবেরুনি মহম্মদ গজনবীর ভারত আক্রমণকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি একজন নাগার্জ্জুনের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নাগার্জ্জুন সোমনাথের নিকট জন্মগ্রহণ করেন এবং রসায়নের সারসংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এলবেরুনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য এবং তিনি এলবেরুনির একশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রামাণগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অধিকাংশ প্রমাণ অনুসারে নাগার্জ্জুন রাজা শতবাহনের সমসাময়িক ব্যক্তি। এই শতবাহন দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রবংশের একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রবংশ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৩ সাল হইতে খ্রীষ্টপরে ২১৮ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অন্ধ্রবংশ শতবাহনবংশ নামেও প্রসিদ্ধ। শতবাহনবংশের ঠিক কোন নৃপতি নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক ছিলেন তাহা সঠিক স্থির করা কঠিন। সেইজন্য আমরা নাগার্জ্জুনকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দীর রাসায়নিক বলিয়া স্থির করিলাম।

নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইলে হুয়েন স্যাং এর শ্রুত কিম্বদন্তীর অর্থ সঙ্গত হয়। রসরত্নাকরের রাজা শালীবাহন খুব সম্ভবতঃ রাজা শতবাহনের সহিত অভিন্ন। রাজতরঙ্গিণীর মতে নাগার্জ্জুন রাজা কণিষ্কের সমসাময়িক। কিন্তু কণিষ্কের কাল লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ আছে। ফ্লিট সাহেব কণিষ্কের রাজত্ব আরম্ভের কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৭ সাল করিয়াছেন, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ১২০ খ্রীষ্টাব্দ করিয়াছেন এবং ভাণ্ডার্কার ২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ করিয়াছেন। কণিষ্কের যে কালই নির্দ্ধারিত হউক, নাগার্জ্জুনকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বেশী ভুল হইবে না। এলবেরুণি নিশ্চয়ই নাগার্জ্জুনের কাল ভুল করিয়াছেন। তিনি রসায়নশাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতেন এবং "রস" অর্থে পারদ না করিয়া "স্বর্ণ" করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে, নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য, অথচ লিখিতেছেন যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে নাগার্জ্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া অন্য প্রমাণের বিরোধী মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ডাক্তার রায় নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ রসরত্নাকর নামক গ্রন্থের যে অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সপ্তম শতাব্দীর একখানি তন্ত্র বলিয়া তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমার নিজের মত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রোক্ত ধাতুর অয়স্কৃতিবিধিই নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ধাতুমারণ-প্রক্রিয়া। পরবর্ত্তী কালে ঐ প্রক্রিয়ার বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে; এই রসরত্নাকরে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া, বিবিধ ধাতুর সত্বপাতন-বিধি, ধাতুমারণবিধি এবং প্রায় পঁচিশ প্রকার যন্ত্রের (যথা,—ভূধর যন্ত্র, দোলা যন্ত্র, ইত্যাদি) বর্ণনা আছে।

———

বৃন্দ ও চক্রপাণি।

বৃন্দ ও চক্রপাণি নাগার্জ্জুনের পরবর্ত্তী এবং তাঁহাদের গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের প্রভাব বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তাঁহারা তান্ত্রিক যুগের লেখক ছিলেন, কিন্তু বৃন্দের সময়ে ধাতুঘটিত ঔষধ সকলের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ তাদৃশ প্রবল হয় নাই। উভয়েই নাগার্জ্জুনের আবিষ্কৃত কজ্জলী ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন; চক্রপাণিই ভারতের প্যারাসেল্‌সস্‌ নামের অধিকারী। তিনি নিজেই গৌরব করিয়া গিয়াছেন, "এষা পর্প্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা"। তাঁহার সময় হইতে ধাতুঘটিত ঔষধ খুব বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।—

চক্রপাণির আবির্ভাবকাল সঠিক জানা আছে। তিনি নিজের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থেই সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র-
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥

চক্রপাণি লোধ্রবলীবংশসম্ভূত, তাঁহার অগ্রজের নাম ভানু, পিতার নাম নারায়ণ। তাঁহার পিতা গৌড়াধিপতির পাকশালার পর্য্যবেক্ষক ছিলেন। এই নারায়ণ গৌড়াধিপতি রাজা ন্যায়পালের চিকিৎসক ছিলেন। রাজা ন্যায়পাল ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন।* অতএব চক্রপাণির কাল ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। চক্রপাণি তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থ ভিন্ন চরক ও সুশ্রুতের টীকাও লিখিয়াছেন।

বৃন্দ চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। চক্রপাণির সংগ্রহ-গ্রন্থ বৃন্দের সিদ্ধযোগ

---

* বৈদ্যকশব্দসিন্ধু— ১।০ পৃষ্ঠা।

অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। অতএব বৃন্দ চক্রপাণির অন্ততঃ দুই শতাব্দী অগ্রে আবির্ভূত হইলে নবম শতাব্দীর লোক হইলেন। অষ্টম শতাব্দীতে নিদান পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বৃন্দের সিদ্ধযোগ ঐ সময়ে অনূদিত না হওয়াতে উহার অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনত্ব ঘোষিত হইতেছে। উপরোক্ত আয়ুর্ব্বেদকারগণের কালবিচারের ফল নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বৈদিক যুগ।

অথর্ব্ববেদ	খ্রীঃ পূর্ব্ব ১০০০।
কৌশিক সূত্র	×

আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ।

চরক	খ্রীঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী।
সুশ্রুত	খ্রীঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী (?)
দৃঢ়বল	খ্রীঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী।
বাগ্‌ভট	খ্রীঃ পরে তৃতীয় শতাব্দী।
মাধবাচার্য্য	খ্রীঃ পরে পঞ্চম শতাব্দী।

তান্ত্রিক যুগ।

নাগার্জ্জুন	খ্রীষ্ট পরে দ্বিতীয় শতাব্দী
বৃন্দ	খ্রীষ্ট পরে নবম শতাব্দী।
চক্রপাণি	খ্রীষ্ট পরে একাদশ শতাব্দী।

বৃন্দ ও চক্রপাণি ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিলেও চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকারের মত ভেষজঘটিত ঔষধের সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। নাগার্জ্জুনের আবির্ভাবের পর বহুবিধ তান্ত্রিক গ্রন্থ ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থে পারদ ও অন্যান্য ধাতুঘটিত

ঔষধেরই সমধিক প্রাবল্য। এই সকল তান্ত্রিক গ্রন্থকে "রসগ্রন্থ" বলা হইত (রস, পারদ)। নিম্নে কয়েকখানি রসগ্রন্থের কাল ডাক্তার রায়ের মতানুযায়ী লিপিবদ্ধ হইল।—

রসগ্রন্থ	গ্রন্থকার	কাল
রসরত্নাকর	নাগার্জ্জুন (?)	সপ্তম শতাব্দী
রসহৃদয়	গোবিন্দ ভাগবত	একাদশ শতাব্দী
রসেন্দ্রচৌড়ামণি	সোমদেব	দ্বাদশ শতাব্দী
রসার্ণব	×	দ্বাদশ শতাব্দী
রসরত্নসমুচ্চয়	বাগ্‌ভট (?)	ত্রয়োদশ শতাব্দী
রসপ্রকাশ-সুধাকর	যশোধর	ঐ
রসকল্প	×	ঐ
রসসার	গোবিন্দাচার্য্য	ঐ
রসরাজলক্ষ্মী	বিষ্ণুদেব	চতুর্দ্দশ শতাব্দী
রসরত্নাকর	নিত্যনাথ	ঐ
রসেন্দ্রচিন্তামণি	ঢুণ্ঢুকনাথ	ঐ
শার্ঙ্গধরসংগ্রহ	শার্ঙ্গধর	ঐ
রসেন্দ্রসারসংগ্রহ	গোপালকৃষ্ণ	ঐ
ধাতুরত্নমালা	দেবদত্ত	ঐ
ভাবপ্রকাশ	ভাবমিশ্র	ষোড়শ শতাব্দী
অর্কপ্রকাশ	রাবণ (?)	ঐ

এই সকল রসগ্রন্থ ভিন্ন বহুসংখ্যক রসগ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, তান্ত্রিক যুগ বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিক কাল আয়ুর্ব্বেদীয় ও তান্ত্রিক যুগের দ্বারা মিলিত একটি "মিশ্রিত যুগ" বলা যায়; কারণ, উভয়বিধ ঔষধই এখন বহুলপরিমাণে প্রচলিত।

এই অসংখ্য তান্ত্রিক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায়

গ্রন্থকার।	রসগ্রন্থ।
আনন্দ অনুভব	রসদীপিকা।
কঙ্কালী	রসকঙ্কালী।
কপালী	রসরাজমহোদধি।
কাশীরাম	রসকল্পলতা।
কেশবদেব	যোগরত্নাকর।
কেশবদেব	সিদ্ধতন্ত্র।
গঙ্গাধর	রসসারসংগ্রহ।
গুরুদত্ত (সিদ্ধ)	রসরত্নাবলী।
গোবিন্দ	রসগোবিন্দ।
গোবিন্দাচার্য্য	রসসার।
গোবিন্দাচার্য্য	রসহৃদয়।
গোপাল দাস	যোগামৃত।
গোরক্ষ	গোরক্ষসংহিতা।
চন্দ্ররাজকবি	রসরত্নাবলী।
চক্রপাণি	রসরত্নাকর।
চন্দ্রসেন	রসচন্দ্রোদয়।
চর্পটি	চর্পটিসিদ্ধান্ত।
চামুণ্ড	রসসঙ্কেতকলিকা।
জয়দেব	রসামৃত।
জাবল	তন্ত্ররাজ।
ত্রিমলভট্ট	রসদর্পণ।
বল্লভদ্র	নবরত্ন ধাতুবিবাহ।
বররুচি	যোগাসন।
বন্দীমিশ্র	যোগসুধানিধি।
বাসুদেব	রসসর্ব্বেশ্বর।
বৈদ্যরাজ	রসকষায় বৈদ্যক।
ব্রজরাজ শুক্ল	রসরাজসুধানিধি।
ভোজদেব	রসরাজমৃগাঙ্ক।
ভোজরাজ	রসরাজমার্ত্তণ্ড।
ভৈরব	রসেন্দ্রভৈরব।
মল্লারি	রসকৌতুক।
মাধব	রসকৌমুদী।
মাধব	আয়ুর্ব্বেদরসশাস্ত্র।
মাণ্ডব	রসবারিধি।
যশোধর	রসপ্রকাশসুধাকর।
যোগসিদ্ধ	যোগমালা।
রসেন্দ্রতিলকযোগী	রসসারতিলক।
রসাঙ্কুশ	মহারসাঙ্কুশ।
রসেন্দ্র	রসেন্দ্রভাণ্ডাগার।
রাজরাজ	রসরত্নপ্রদীপ।
রামসেন	রসসারামৃত।
রামেশ্বর ভট্ট	রসরাজলক্ষ্মী।
রাজকৃষ্ণ ভট্ট	রসেন্দ্রকল্পদ্রুম।

দত্তাত্রেয় —দিব্যরসেন্দ্রসার।
দত্তাত্রেয় —দত্তাত্রেয় তন্ত্র।
দেবাচার্য্য—রসরত্নাকর।
ধনপতি—দিব্যরসেন্দ্রসার।
হরহরি—রসযোগমুক্তাবলী।
নরবাহন—রসানন্দকৌতুক।
নাগার্জ্জুন—নাগার্জ্জুনীয়।
নিত্যনাথ—রসরত্নমালা।
নীলাম্বর—রসচন্দ্রিকা।
পরশুরাম—রসরাজশিরোমণি।
প্রতাপরুদ্রদেব—কৌতুকচিন্তামণি।
শঙ্করজী—রসরাজশঙ্কর।
শিবনন্দন গোস্বামী—রসবিদ্যারত্ন।
শূরসেন—রসেন্দ্রশূরপ্রভাব।
শ্রীনাথ—রসরত্ন।
সিদ্ধ কালীনাথ—রসমঞ্জরী।
সিদ্ধ প্রাণনাথ—রসদীপ।
সিদ্ধ ভাস্কর—রসেন্দ্রভাস্কর।
সূর্য্যকবি—রসভৈষজ্যাবলী।
হরিহর—রসাধিকার।
হরিহর—রসবিশ্বদর্পণ।
হরিহর—রসসঞ্জীবনী।

ভারতীয় রসায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, অথর্ব্ববেদের মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে ভারতের চিকিৎসা-বিদ্যার জ্ঞান ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অর্দ্ধলুক্কায়িত আছে। অথর্ব্ববেদের সময় হইতে যেমন আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, রসায়ন শাস্ত্রও উহার সহিত বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া চলিয়াছে।

প্রথমেই বৈদিক যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীস ও ত্রপু এই ছয় ধাতুর আবিষ্কার সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার খুব সমধিক প্রচলন ছিল, কারণ স্বর্ণ ধাতু অবস্থাতেই স্বভাবতঃ পাওয়া যায়। যখন এই সকল ধাতু বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তখন

যে সকল খনিজ দ্রব্য হইতে এই সকল ধাতু প্রস্তুত হয়, তাহাও অজ্ঞাত ছিল না এবং ধাতুপ্রস্তুত-প্রক্রিয়ার (metallurgy) জ্ঞানও কিছু কিছু ছিল। সোমরস ও মদ্যবর্গ যজ্ঞ উপলক্ষে দেবতাদিগকে প্রদান করা হইত এবং প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইত। অতএব মদ্যপ্রস্তুত-প্রক্রিয়ার (fermentation) জ্ঞানও তাঁহাদের ছিল। দধির উল্লেখ ঋক্‌বেদেও পাওয়া যায়; সুতরাং দুগ্ধের ল্যাকটিক ফারমেণ্টেশন (lactic fermentation) এর জ্ঞানও বৈদিক যুগে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই সকল প্রক্রিয়া-নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের জ্ঞান প্রাচীন ঋষিগণের ছিল না, আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সকল প্রক্রিয়া তখন অজ্ঞাত ছিল না। উহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইউরোপেও অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল।

আয়ুর্ব্বেদীয় যুগে দেখিতে পাই, মদ্যবর্গের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। নানা প্রকার আসব, শীধু, মদ্যের উল্লেখ চরক ও সুশ্রুতে পাওয়া যায়। সৌবীরকাঞ্জিক, ধান্যাম্ল, তুষোদক (vinegar) আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ছয় ধাতু ধাতুবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। নানা-প্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত ও স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি রত্নবর্গও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। গন্ধকের ব্যবহারও চরক ও সুশ্রুতে আছে। পঞ্চলবণ ও দুই ক্ষার এবং সোহাগা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যবক্ষার (carbonate of potash) এবং সর্জ্জিকাক্ষার (carbonate of soda) বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইউরোপে বহুশতাব্দীর পরে এই পার্থক্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুশ্রুতে মৃদু (mild) মধ্যম ও তীক্ষ্ণ (caustic) ক্ষারের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বেশ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চূণের দ্বারা তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা উন্নত রাসায়নিক

জ্ঞানের সাক্ষ্য দিতেছে। সুশ্রুতে ও বাগ্‌ভটে পারদেরও উল্লেখ আছে। চরকেও ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুশ্রুতে ধাতুর অয়স্কৃতি পরবর্ত্তী কালের ধাতু মারণের পূর্ব্বাভাস দিতেছে।

তান্ত্রিক যুগে ভারতের প্রাচীন রসায়নের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। নাগার্জ্জুনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যক্‌পাতন, ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন, ধাতুর শোধন, জারণ মারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিবিধ ধাতুর অনেকগুলি নূতন নূতন যৌগিক (compound) এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। কালো সল্‌ফাইড অব মার্কারি (কজ্জলী), লোহিত সাল্‌ফাইড অব মার্কারি (red sulphide of mercury, (রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর), কেলোমেল (রসকর্পূর) ফেরিক অক্‌সাইড (ferric oxide, পুটিত লৌহ), সাল্‌ফাইড অব কপার (sulphide of copper, মারিত তাম্র), অক্‌সাইড অব জিঙ্ক (oxide of zinc, মারিত যশদ), অকসাইড অব লেড (oxide of lead, মারিত সীসক), আর্সেনাইট অব পটাশ (arsenite of potash, হরিতালভস্ম), প্রভৃতি বিবিধ যৌগিক এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক অম্ল (nitro-hydrochloric acid, সর্ব্বজারণ, বিড), সালফিউরিক এসিড (গন্ধক বা তেজাব) প্রভৃতি অজৈব অম্লও আবিষ্কৃত এবং ঔষধার্থ সেবিত হইত। জৈব অম্লের মধ্যে এক ধান্যাম্ল (vinegar) ভিন্ন অন্য অম্ল আবিষ্কৃত হয় নাই। ধাতুসকলের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া (metallurgy) বেশ বিশদভাবে এই সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। কোন কোন বিষয়ে ভারতের রসায়নজ্ঞান তাৎকালিক ইউরোপীয় রাসায়নিক জ্ঞানের অপেক্ষা উন্নত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ভাবমিশ্র তুঁতের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছিলেন, "তুত্থং তু তাম্রোপধাতুহি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবতি।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুয়রহেব (Boerhave) তুঁতের মধ্যে

তাম্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার নানাপ্রকার মিথ্যা উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ইউরোপ ও ভারতের বিফল চেষ্টা অনেকাংশ একরূপই দৃষ্ট হয়। ধাতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতের রাসায়নিকগণের কল্পনা আদৌ উন্নত হয় নাই। উহা বরাবরই পৌরাণিক হইয়া রহিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধাতুবর্গ।

বৈদিক যুগ।

ঋগ্বেদে স্বর্ণের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটি উদাহরণ এখানে প্রদত্ত হইল—যথা, "হিরণ্ময়ান অৎকান" (৫।১৫।৬), "শিপ্রাঃ শীর্ষসু বিততা হিরণ্ময়ী"(৫।৫৪।১)ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ঋগ্বেদ রচনাকালে যোদ্ধৃবর্গ সুবর্ণের বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। ঋগ্বেদে স্বর্ণকারেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা, "দ্রবিঃ ন দ্রাবয়তি" (৬।৩।৪), "নিষ্কং...শুণবতে স্রজং বা" (৮।৪৭।১৫)। পঞ্চম মণ্ডলের নবম সূক্তের পঞ্চম ঋকে কর্ম্মকারের ভস্ত্র যন্ত্রের অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে লৌহের উল্লেখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থে "অয়স্" শব্দের বহুস্থানে প্রয়োগ আছে—যথা, "অয়সঃ ন ধারাং" (৬।৪৭।১০), "আয়সীভিঃ" (৭।৩।৭; ৭।১৫।১৪; ৭।৯৫।১) ইত্যাদি। অয়স্ শব্দ সাধারণতঃ লৌহ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সায়ন ঐ সকল স্থলে অয়স্ শব্দের অর্থ সুবর্ণ করিয়াছেন। বাচস্পত্যাভিধান "তোজোঽয়সো ন ধারাং" প্রভৃতি স্থানে অয়স্ শব্দের লৌহ অর্থ করিয়াছে। রমেশচন্দ্র

দত্ত মহাশয় ও উইল্‌সন সাহেব অয়স্‌ শব্দের লৌহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়নের অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ না হওয়াতে "অয়স" অর্থে এখানে লৌহ করা হইল।

শুক্ল যজুর্ব্বেদে ছয়টি ধাতুর উল্লেখ দেখিতে পাই—"হিরণ্যং চ মে, অয়শ্চ মে, শ্যামং চ মে, লোহং চ মে, সীসং চ মে, ত্রপু চ মে, যজ্ঞেন কল্পন্তাম্" (১৮।১৩)। *

অথর্ব্ববেদে স্বর্ণের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে হইলে এই পরিচ্ছেদের আকার বৃহৎ হইয়া যাইবে। স্বর্ণ সচরাচর ধাতু অবস্থায় পাওয়া যায় বলিয়াই উহা সর্ব্বপ্রথমে মানবের ব্যবহারে আইসে। রৌপ্যের উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থে তত বেশী স্থলে দৃষ্ট হয় না।† অথর্ব্ববেদে আট দশ স্থানে লৌহের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। "অয়স্" "অয়স্ময়" প্রভৃতির উল্লেখ নানা স্থানে আছে।‡ তাম্রের উল্লেখ দুই এক স্থানে দেখিলাম—"লোহিতময়" (২।৩।৭), (৮।৬।১৭)। অথর্ব্ববেদে নানা ব্যাধি নিবারণের জন্য সীসের মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, যথা ; ১, ১৬, ২ ; ১, ১৬, ০ ; ২, ১, ১৯ ; ২, ১, ২০ ; ২, ১. ৫৩। ঐ বেদে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, (৫।২৮।৯), ধাতুর মাদুলী বা বলয় ধারণ দ্বারা বিবিধ ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ গ্রন্থে আমরা সর্ব্বপ্রথমে ঔষধরূপে ধাতুর বাহ্যিক ধারণের (external application) আভাস পাইয়া থাকি। পরবর্ত্তী তান্ত্রিকযুগে ঐ সকল ধাতুর ভস্ম সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধরূপে সেবিত

* Ray's History of Hindu Chemistry Vol. I., p. 83.

† "রজস্"—অথর্ব্ববেদ (৫।২৮।২ ; ৫।২৮।৯)।

‡ অথর্ব্ববেদে লৌহের উল্লেখ :—২।৩।৭।৫।২৮।৯ ; ৫।২৮।২ ; ৬।৬৩।২ ; ৬।৬৩।৩ ৬।৪৮।৩ ; ৬।১৪১।২ ; ৭।১১৫।১ ; ৮।৩।২ ; ১০।২৮।৪০; ১৯।৬৬।১ ; ২০।৩০।৩

(internally) হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ হইতে তান্ত্রিক যুগ পর্য্যন্ত আমরা ভারতে ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার ও সেবনের ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের আভাস বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই।

মনু তাম্র, লৌহ, কাংস্য, ত্রপু, সীসক প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত ("তাম্রায়ঃ-কাংস্যরেত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ") ভোজন ও রন্ধনপাত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ Natural history নামক গ্রন্থে সিন্ধুদেশ বর্ণনা করিতে গিয়া তথাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক ষ্ট্রাবো (Strabo) তাঁহার বিখ্যাত ভূ-ভ্রমণ বৃত্তান্তে গুজরাট অঞ্চলের বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, "রৌপ্য অন্য দেশ হইতে ঐ স্থানে আমদানি হইত"।

আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ।

সুশ্রুতের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদে ছয়টি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসক ও লৌহ। শার্ঙ্গধর এবং বিশেষতঃ তাহার টীকাকার নয়টি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাম্র, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, স্বর্ণ, লৌহ, কাংস্য ও বৃত্তলৌহ। তাঁহারা সূর্য্য প্রভৃতি নবগ্রহ হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে, এরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* এই নবগ্রহমূলক নয়ধাতুবাদ দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে, আয়ুর্ব্বেদের ধাতুবাদ গ্রীকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু

---

* তাম্রতারারনাগাশ্চ হেমবঙ্গৌ চ তীক্ষ্ণকম্।
কাংস্যকং বৃত্তলোহং চ ধাতবো নবমস্মৃতাঃ।
সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং তে কথিতা নামভিঃ ক্রমাৎ॥ শার্ঙ্গধর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই নয়ধাতুবাদ আয়ুর্ব্বেদে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই, কারণ শার্ঙ্গধরের পরে রচিত ভাবপ্রকাশে নয়টি ধাতুর উল্লেখ নাই, সাতটি ধাতুর উল্লেখ আছে, যথা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, যশদ, সীসক, বঙ্গ ও লৌহ। *

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (Metallurgy).

প্রত্যেক ধাতুর নিম্নে উহার প্রস্তুত-প্রক্রিয়া আলোচিত হইবে।

ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity).

আয়ুর্ব্বেদে ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা কোথাও দেখিতে পাই নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত আইন আকবরী নামক গ্রন্থে ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের তিনটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ তালিকা আলবেরুনির দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া আইন আকবরীতে লিখিত আছে। † ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব দুই উপায়ে নির্ণীত হইয়াছে।

প্রথম—সমপরিমিত স্থানাধিকৃত (equal volumes) ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন ওজন হইবে। যে সকল দ্রব্য বেশী গুরু, তাহাদের ওজন সেই পরিমাণে বেশী হইবে এবং যে সকল দ্রব্য বেশী লঘু, তাহাদের ওজন সেই পরিমাণে কম হইবে। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত আনুমানিক আপেক্ষিক গুরুত্বের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ধাতু	...	...	ওজন
স্বর্ণ	...	...	১০০
পারদ	...	...	৭১
রৌপ্য	...	...	৫৪

* স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ বঙ্গং যশদমেব চ।

† Gladwin's Ayeen Akbari. Vol I. p. 43,

সীসক	...	...	৫৯
লৌহ	...	...	৪০'
তাম্র	...	...	৪৫
পিত্তল	...	...	৪৫

সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥ ভাবপ্রকাশ।

দ্বিতীয়—সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের (Archimedes, খ্রীঃ পূঃ ২৮৭) আবিষ্কৃত তথ্য অনুযায়ী আপেক্ষিক গুরুত্বনির্দ্ধারণ। একটি জলপূর্ণ পাত্রে ১০০ ভাগ ওজনের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু নিক্ষেপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন ওজনের জল উপচাইয়া পড়িয়া যাইবে। যে দ্রব্য যত গুরু, সেই দ্রব্য তত কম জল ফেলিয়া দিবে এবং যে দ্রব্য যত লঘু, সেই দ্রব্য তত বেশী জল ফেলিয়া দিবে।

ধাতু			১০০ ভাগ ওজনের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে যতটুকু জল পড়িয়া যাইবে, তাহার ওজন।
স্বর্ণ	...	...	৫
পারদ	...	...	৭
সীসক	...	...	৮
রৌপ্য	...	...	৯
তাম্র	...	...	১১
পিত্তল	...	...	১১
লৌহ	...	...	১২
বঙ্গ	...	...	১৩

বৈজ্ঞানিক ইহা হইতে সহজেই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

ধাতুর আকর।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে কোথায় কোথায় ধাতুর খনি ছিল, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সেরূপ খনির উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্লিনী (প্রথম শতাব্দী) সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকরের উল্লেখ করিয়াছেন। আইন আকবরীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বর্ণনাকালে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন স্থানে ধাতুর খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। এখানে সেই সকল খনির একটা তালিকা একত্র সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।

	সুবা।	সরকার বা সহর।	কি ধাতুর খনি।
(১)	বাঙ্গালা।	বাজুহা।	লৌহ।
(২)	ঐ	মাদুরন।	হীরক।
(৩)	আলাহাবাদ।	কালিঞ্জর।	হীরক।
(৪)	অযোধ্যা।	অযোধ্যা।	মাটি খুঁড়িলে স্বর্ণের কণা পাওয়া যায়।
(৫)	আগ্রা।	বায়না।	তাম্র।
(৬)	ঐ	বিরাট।	কয়েকটি তাম্রের খনি; একটি রূপার খনি।
(৭)	ঐ	সিঙ্গনে দাদীতুর ও কোট পোটনী।	কয়েকটী তাম্রের খনি।
(৮)	গুজরাট।		এখানে রোম ও ইরাক প্রদেশ হইতে রৌপ্য আমদানি হয়।
(৯)	দিল্লী।	কুমায়ুন।	স্বর্ণ, সীসক, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, হরিতাল ও সোহাগা।

(১০) লাহোর।		পঞ্জাবের নদী-সকলের বালি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, বঙ্গ, সীসক পাওয়া যায়।
(১১) কাশ্মীর।	কেরো।	লোহ।
(১২) কাশ্মীর।	পল্লী।	নদীর জলে ও বালুকাতে স্বর্ণ-কণা।
(১৩) ঐ	কান্দাহার।	পুরাতন লোহ-কারখানা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে আমরা প্রত্যেক ধাতুর প্রাচীন ইতিহাস, প্রস্তুত-প্রক্রিয়া, শোধন ও মারণ-প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ক্রিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্ণ।

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে স্বর্ণ ভারতে ব্যবহৃত হইতেছে।

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (metallurgy)—ভারতে পতঞ্জলি ও নাগার্জ্জুন ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহাদের উক্তি কতক কতক উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ লিখিয়াছেন যে, স্বর্ণ মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মহর্ষির শুক্র হইতে উৎপন্ন

হইয়াছে।* এই পৌরাণিক আখ্যান ব্যতীত স্বর্ণ-প্রস্তুত-প্রণালীর বিবরণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। আইন-আকবরী নামক গ্রন্থে আকবরের সময় ভিন্ন ভিন্ন সুবার বর্ণনাকালে কোথায় কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হইত, তাহার বর্ণনা আছে। সেই সকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণ নিম্নলিখিত চারি প্রকার স্থান হইতে আহৃত হইত।— (১) পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বর্ণের খনি, (২) কোন কোন নদীর জল, (৩) নদীতীরস্থ বালুকা ও (৪) মৃত্তিকা। দিল্লী সুবার উত্তরে কুমায়ুনে স্বর্ণের খনি ছিল।† কাশ্মীর সুবার অন্তর্গত পকিলী (?) নামক স্থানে নদীর জল হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। নদীর স্রোতে প্রথমে লম্বা লম্বা লোম সমেত ছাগচর্ম্ম বিছান হইত এবং স্রোতে যাহাতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া না যায়, সেই জন্য পাথরের দ্বারা চাপিয়া রাখা হইত। দুই তিন দিবস পরে চর্ম্মগুলি সযত্নে তুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকান হইত। বেশ শুকাইয়া যাইলে ঝাড়িয়া স্বর্ণের কণা সংগ্রহ করা হইত। এই উপায়ে এক এক বারে তিন তোলা পর্য্যন্ত স্বর্ণ পাওয়া যাইত।‡ লাহোর সুবা বা পাঞ্জাবের নদীসমূহের তীরস্থ বালুকা ধুইয়া ও চালিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যাইত।§ অযোধ্যানগরীর চারিধারের মৃত্তিকায় স্বর্ণকণা পাওয়া যাইত এবং ঐ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত হইত।¶

কৃত্রিম স্বর্ণ। লৌহ তাম্র প্রভৃতি হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা

* ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বখণ্ড, ৪১৬ পৃঃ।
† Gladwin's Ayeen Akbery Vol. II. p. 87.
‡ Ibid. Vol. II. p. 136.
§ Ibid. Vol, II. p. 109.
¶ Ibid. Vol. II. p. 22.

প্রাচীন রাসায়নিকগণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন রাসায়নিকগণ পরেশপাথর (Philosopher's stone) এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতেও পরেশপাথরের অলৌকিক গুণের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। আইন আকবরীতে পরেশপাথর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটী বিবৃত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে মালবপ্রদেশে জয়সিংহ দেব নামক একজন পরমধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্ রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে একজন কৃষক ধান কাটিতে কাটিতে দেখিতে পাইল যে, তাহার কাস্তেখানি একখানি পাথরে লাগিয়া সোনা হইয়া গিয়াছে। মূর্খ কৃষক ভাবিল যে, তাহার কাস্তেখানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য সে তাহার অস্ত্র ও পাথরখানা এক কামারের নিকট লইয়া যাইল। বুদ্ধিমান্ কামার ব্যাপার দেখিয়া বুঝিল যে, এ পাথর সামান্য পাথর নহে, উহা পরেশপাথর। কামার পাথরখানি রাখিয়া দিল এবং তাহার যাবতীয় লোহার জিনিসে পরেশ পাথর স্পর্শ করাইয়া সোনা করিয়া লইল। এইরূপে সে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভাবিল যে. এ পাথর রাজার নিকটেই থাকা উচিত। এই ভাবিয়া সে পাথরখানি রাজাকে উপহার প্রদান করিল। রাজা জয়সিংহ অনতিবিলম্বে প্রভূত ধনের অধিকারী হইলেন এবং দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণান্তে তিনি নর্ম্মদা-তীরে প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্য এক বিশাল ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। সেই ভোজে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রাজপুরোহিতকে পরেশপাথরখানি দান করিলেন। পুরোহিত মহাশয় রাজানুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ সামান্য একখানি পাথর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাথরখানি নর্ম্মদার জলে ফেলিয়া দিলেন। যখন শুনিলেন যে. তিনি লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া হেলায় হারাইয়াছেন, তখন দিগ্বিদিক্-

জ্ঞানশূন্য হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন, কিন্তু সেখানে জল এত গভীর ছিল যে, উহার তলদেশ খুঁজিয়া পাইলেন না। এইরূপে পরেশ পাথর অন্তর্হিত হইল এবং এখনও পর্য্যন্ত সেখানে নদীর জল অতলস্পর্শ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। *

এখন পর্য্যন্ত অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, ভারতের সাধু সন্ন্যাসীরা কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন। উহা স্বর্ণ হইতেই পারে না; রৌপ্য তাম্র, সীস, পারদ প্রভৃতির মিশ্রধাতু (alloy) বা হরিতালের দ্বারা বা অন্যপ্রকারে স্বর্ণের ন্যায় রং করা কোন দ্রব্য হইতে পারে। নিম্নে রৌপ্য ও তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিবার কয়েকটী প্রাচীন প্রক্রিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১) "রাজবর্ত্তকে শিরীষপুষ্পের রসের দ্বারা ভাবনা দিলে এক গুঞ্জা পরিমাণ রৌপ্য একশত গুঞ্জা পরিমাণ নবোদিত সূর্য্যসন্নিভ স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি?"

(২) "গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া রৌপ্যের সহিত তিনবার ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?"

* Ibid. Vol. II. p. 42.

(১) কিমত্র চিত্রং যদি রাজবর্ত্তকং
শিরীষপুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্।
সিতং সুবর্ণং তরুণার্কসন্নিভং
করোতি গুঞ্জাশতমেকগুঞ্জয়া॥

(২) কিমত্র চিত্রং যদি পীতগন্ধকঃ
পলাশনির্য্যাসরসেন শোধিতঃ।
আরণ্যকৈরুৎপলকৈস্তু পাচিতঃ
করোতি তারং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্॥

(৩) "যদি রসককে (calamine) ……তিনবার তাম্রের সহিত পুটপাক করা যায়, তাহা হইলে তাম্র কাঞ্চনে পরিণত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? *

(৪) "মেষের দুগ্ধ ও বহু অম্লরসের দ্বারা দরদকে (cinnabar) অনেকবার ভাবনা দিলে রৌপ্য সাক্ষাৎ কুঙ্কুমসদৃশ স্বর্ণে পরিণত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?" †

ভাবপ্রকাশ পারদাদিসংযুক্ত স্বর্ণকে কৃত্রিম স্বর্ণ বলিয়াছেন।" ‡

স্বর্ণশোধন —"স্বর্ণকে অতি সূক্ষ্মপাত করতঃ অগ্নিতে পোড়াইয়া যথাক্রমে তিলতৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের কাথে তিন তিনবার নিমগ্ন করিবে অর্থাৎ একবার পোড়াইবে ও এক একবার উপরি উক্ত দ্রবদ্রব্যে ক্রমান্বয়ে নিক্ষেপ করিবে। ইহা দ্বারা স্বর্ণ শোধিত হইবে।" এই শোধন প্রক্রিয়ার কি প্রয়োজন, বুঝিতে পারিলাম না, কারণ, এই সকল প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের কোনও রাসায়নিক পরিবর্তন আদৌ হইবে না। পরবর্তী জারণ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণকে সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত করিতে সম্ভবতঃ এই শোধনক্রিয়া সহায়তা করিতে পারে।

* (৩) কিমত্র চিত্রং রসকো রসেন।
ক্রমেণ কৃত্বাম্বুধরেণ রঞ্জিতঃ
করোতি শুল্বং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্

† (৪) কিমত্র চিত্রং দরদঃ সুভাবিতঃ
পয়েন মেষ্যা বহুশোঽম্লবর্গৈঃ।
সিতং সুবর্ণং বহুধর্ম্মভাবিতং
করোতি সাক্ষাদ্বরকুঙ্কুমপ্রভম্॥
নাগার্জ্জুন-বিরচিত রসরত্নাকর।

‡ কৃত্রিমঞ্চাপি ভবতি তদ্রসেন্দ্রস্য বেধতঃ। ভাবপ্রকাশ।

স্বর্ণমারণ—স্বর্ণকে মারিত করিবার জন্য অনেকগুলি মতান্তর প্রক্রিয়া আছে, তাহার মধ্যে যেটি সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহার আলোচনা করা যাইবে।

সুবর্ণকে অতি সূক্ষ্মপাত্ত করণানন্তর দ্বিগুণ পরিমাণ পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাকে অম্লরস দ্বারা মর্দ্দন করিবে, তৎপর পিণ্ডাকৃতি করিয়া উভয়ের সমপরিমাণ গন্ধকচূর্ণ ঐ গোলকের অধঃ ও উর্দ্ধদেশে প্রদান করিবে। অনন্তর মুষামধ্যে ঐ পিণ্ডাকৃতি পদার্থ রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড ও সজল মৃত্তিকা দ্বারা লেপন পূর্ব্বক উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর ৩০ খানা বিলঘুঁটে দ্বারা পুটপাক করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দশবার পুটপাক করিবে এবং প্রত্যেক পাকেই গন্ধকদ্বারা লিপ্ত করিয়া পুট দিতে হইবে। এই নিয়মে পাক করিলে সুবর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হয় অর্থাৎ ঐ ভস্মীভূত স্বর্ণ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না।*

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার প্রথমে সুবর্ণ ও পারদে মিশ্রিত হইয়া মিশ্রধাতু (amalgam) উৎপন্ন হয়। পরে পারদ ও গন্ধক সংযুক্ত হইয়া কজ্জলীতে পরিণত হয় এবং বার বার পুটপাক কালে উর্দ্ধগামী হইয়া যায়। ফলে স্বর্ণ সূক্ষ্মগুঁড়া অবস্থায় নিম্নে পড়িয়া থাকে। †

আজ কাল অনেক কবিরাজ মহাশয়েরা স্বতন্ত্র জারিত স্বর্ণ প্রস্তুত করেন না। স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে যে স্বর্ণভস্ম বোতলের

* ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড—৬১২ পৃঃ।

† অধ্যাপক রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—(History of Hindu chemistry, Vol I. p. 59) যে "the gold is in reality converted into the sulphide and afterwards into metallic gold in a fine state of powder." কিন্তু বাস্তবিক স্বর্ণ ও গন্ধক সংযুক্ত হইয়া সাল্‌ফাইড্ হয় না (See Roscoe and Schorlemmer's treatise on Chemistry, metals, Vol. II, "gold and sulphur do not combine directly").

নিম্নে পড়িয়া থাকে, তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেখানেও একই রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। কজ্জলী মকরধ্বজ আকারে ঊর্দ্ধগামী হয় এবং স্বর্ণ সূক্ষ্ম গুঁড়া অবস্থায় নিম্নে পড়িয়া থাকে।

জারিত স্বর্ণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ—ডাক্তার ওয়াইজ স্বর্ণ ভস্মকে অক্সাইড্ অব গোল্ড (oxide of gold) মনে করিয়াছেন।* কিন্তু বাস্তবিক উহা অক্সাইড্ নহে। আমি দুইটি নমুনা পরীক্ষা করিয়াছি।

প্রথম। দেখিতে হরিদ্রাভ, খুব সূক্ষ্ম। কতক অংশ জলের উপর "হংসবৎ সমুত্তরতি।" পারদ নাই। গন্ধক নাই। নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Nitric বা Hydrochloric acid) দ্রবণীয় নহে। নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এসিডে (aqua regia) সম্পূর্ণ দ্রবণীয়। উহা যে স্বর্ণের সূক্ষ্ম গুঁড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা এগেটের বা পাথরের খলে মাড়িয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে। খলে খানিকক্ষণ মাড়িলে উজ্জ্বল সাধারণ বর্ণের স্বর্ণের ন্যায় উহা চক্‌চক্ করিতে থাকে। ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন যে, স্বর্ণভস্ম নিরুত্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ উহাকে আর স্বর্ণে পরিণত করা যায় না। ওরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, বলা বাহুল্য, অতি অল্পায়াসে স্বর্ণভস্মকে সাধারণ স্বর্ণে পরিণত করা যায়।

দ্বিতীয়। দেখিতে প্রথম নমুনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ধূসর বর্ণের। পারদ বা গন্ধক নাই। ইহার অতি সামান্য অংশ নাইট্রিক বা হাইড্রো-ক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিঞ্চিৎ অক্সাইড্ অব গোল্ড মিশ্রিত ছিল। খুব বেশী অংশ কেবল নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয়। ইহাকেও এগেটের (agate) বা

---

* Wise—commentary on the Hindu System of Medicine, p. 121.

পাথরের খলে মাড়িলে চক্‌চকে সাধারণ স্বর্ণে পরিণত হয়। অতএব ইহাও সূক্ষ্ম স্বর্ণের গুঁড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিঞ্চিৎ অক্‌সাইড্ অব গোল্ড মিশ্রিত আছে।

স্বর্ণপর্প্পটী।

স্বর্ণপর্প্পটী—স্বর্ণের কোন নূতন যৌগিক (Compound) নহে। উহা সূক্ষ্ম স্বর্ণ, কজ্জলী ও অবিকৃত (free) গন্ধকের একটি মিশ্রণ (mixture)। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করতঃ তৎসহ ৮ তোলা গন্ধক মিশাইয়া লৌহপাত্রে দৃঢ়রূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া রসপর্প্পটীর বিধিমতে পর্প্পটী প্রস্তুত করিলে তাহাকে স্বর্ণপর্প্পটী বলা যায়।" *

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছোট ছোট খণ্ড। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উহার উপাদান—(১) সূক্ষ্ম স্বর্ণের গুঁড়া, (২) কজ্জলী (black sulphide of mercury), (৩) অবিকৃত গন্ধক। পারদের সমপরিমাণ গন্ধক লওয়া হয় বলিয়া অবিকৃত গন্ধকের ভাগ খুব বেশী, কারণ, পারদ উহার ওজনের ছয় ভাগের এক ভাগ গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হয়। যাহা হউক, পর্প্পটী প্রস্তুতকালে সাবধান হইতে হইবে, যেন সমস্ত পারদই গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হয়, নচেৎ পারদ অবিকৃতভাবে থাকিলে বিষক্রিয়া করিবে।

---

* রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—স্বর্ণপর্প্পটী—১৪১ পৃঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

রৌপ্য (Silver)

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈদিক গ্রন্থ-সমূহে স্বর্ণের যেমন ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, রৌপ্যের উল্লেখ তদপেক্ষা অনেক অল্প। অথর্ব্ববেদে রজস্ শব্দের উল্লেখ আছে এবং বিবিধ ব্যাধি নিবারণের জন্য রৌপ্যের কবচ ধারণের ব্যবস্থাও আছে। প্লিনী সিন্ধু-দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ষ্ট্র্যাবো গুজরাট অঞ্চলের বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, "রৌপ্য অন্য দেশ হইতে ঐ স্থানে আমদানি হইত।" ষ্ট্র্যাবোর বহুশতাব্দী পরে লিখিত "আইন আক-বরীতে"ও লিখিত আছে যে, গুজরাটে রোম ও ইরাক প্রদেশ হইতে রৌপ্য আমদানি হইত। আইন আকবরীতে আগ্রাসুবা, দিল্লী সুবা ও লাহোর সুবাতে রৌপ্যের খনি ও কারখানা ছিল বলিয়া লিখিত আছে। সংকলিত প্রাচীন মুদ্রা দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রাচীন হিন্দুরাজাদের রাজত্ব-কালে স্বর্ণ, তাম্র ও রৌপ্য এই তিন প্রকার ধাতুর নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচ-লন ছিল। আয়ুর্ব্বেদে সুশ্রুতের সময় হইতেই রৌপ্য ছয় ধাতুর মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া—(metallurgy)—রৌপ্যের প্রস্তুত প্রক্রিয়া আজ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই; তাহার কারণ, রৌপ্যের কোন খনিজ পদার্থের উল্লেখ বৈদ্যকে পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে রৌপ্যের পৃথক্ খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। সীস ধাতুর খনিজ পদার্থ স্রোতোঽঞ্জন (galena) হইতেই রৌপ্য আহৃত

হইত। স্রোতোঽঞ্জনে অল্প পরিমাণ রৌপ্য প্রায়ই থাকে এবং উহা হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে রৌপ্য আহৃত হইয়া থাকে।

সহজ রৌপ্য—রৌপ্য স্বর্ণের ন্যায় অসংযুক্ত ভাবে পৃথিবীর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।* ভারতেও ঐরূপ রৌপ্য অসংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাইত। রসরত্নসমুচ্চয়কার লিখিয়াছেন, "রৌপ্যম্ সহজং খনিসংজাতং কৃত্রিমং চ ত্রিধা মতম্" অর্থাৎ রৌপ্য ত্রিবিধ—সহজ, খনিজাত ও কৃত্রিম। অধ্যাপক রায় মহাশয় "সহজ" অর্থে "কাল্পনিক" (of mythical origin) করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। "সহজ" অর্থে natural অর্থাৎ স্বাভাবিক হওয়াই উচিত।

খর্পরীকরণ (cupellation)—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, খুব সম্ভবতঃ স্রোতোঞ্জন (galena) হইতেই রৌপ্য আহৃত হইত। এই স্রোতোঞ্জন সীস ধাতুর একটি খনিজ পদার্থ, অতএব সীস ও রৌপ্যকে পৃথক্ করিতে না পারিলে রৌপ্য বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। অধুনা যে উপায়ে সীস ধাতু হইতে রৌপ্যকে পৃথক্ করা হয়, তাহাকে cupellation বলে। ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ "খর্পরীকরণ" করা হইল। বৈদ্যকেও আধুনিক খর্পরীকরণের অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই রৌপ্য ও সীস পৃথক্ করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়।

প্রথমে খর্পর বা মূষা প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত উপায় রসার্ণবে বর্ণিত আছে—"মোক্ষবৃক্ষের ভস্ম দুই ভাগ, ইষ্টকচূর্ণ এক ভাগ ও মৃত্তিকা এক

* "Silver is found uncombined occasionally in masses weighing several cwts"—Newth's Inorganic Chemistry.

ভাগ মিশাইয়া মূষা প্রস্তুত করিলে উহা রৌপ্যশোধনার্থে উত্তম হইবে।"* অধুনা হাড় পুড়াইয়া যে ভস্ম পাওয়া যায়, (bone-ash) তাহার দ্বারা রৌপ্যশোধনার্থ খর্পর (cupel) প্রস্তুত হয়।

তৎপরে রৌপ্যশোধন করিবার জন্য সীসক ও সোহাগা মিশাইয়া ঐ খর্পরে অগ্নির দ্বারা জ্বাল দিবে। রসার্ণব, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি সকল রসগ্রন্থেই এই প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে এই প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।—"একখানি খর্পরে গোল করিয়া ভস্ম ও চূর্ণ সাজাইতে হইবে এবং তাহার উপর রৌপ্য ও সমপরিমাণ সীস রাখিতে হইবে। পরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সীস দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ পাক করিতে হইবে।" †

আইন আকবরীতে এই প্রক্রিয়ার অতি সুন্দর বিশদ বর্ণনা আছে। ‡ ইহার সারমর্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ হইল। প্রথমে গোবর ও বাবুল কাষ্ঠ পুড়াইয়া যে ভস্ম পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা খর্পর প্রস্তুত করা হইত, পরে তাহাতে অশুদ্ধ রৌপ্য সমপরিমাণ সীসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইত। প্রথমে চতুর্থাংশ সীসক মিশ্রিত করিয়া কয়লার আগুনে জ্বাল দেওয়া হইত এবং ফুঁ দিয়া বাতাস দেওয়া হইত। যতক্ষণ ধাতুদ্বয় গলিয়া না যাইত, ততক্ষণ উত্তাপ ও বাতাস দেওয়া হইত। এই

* মোক্ষক্ষারস্য ভাগৌ দ্বৌ ইষ্টকাংশসমন্বিতৌ।
মৃদ্ভাগস্তারশুদ্ধ্যর্থমুত্তমা বরবর্ণিনি॥ রসার্ণব।

† নাগেন টঙ্কনেনৈব বাপিতং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
খর্পরে ভস্মচূর্ণাভ্যাং পরিতঃ পালিকাং চরেৎ॥
তত্র রূপ্যং বিনিক্ষিপ্য সমসীসসমন্বিতম্।
জাতসীসক্ষয়ং যাবদ্ধমেৎ তাবৎ পুনঃ পুনঃ॥
রসরত্নসমুচ্চয়।

‡ Gladwin's Ayeen Akbari, Vol. 1. p. 14.

উপায়ে চারিবারে সমস্ত সীস দেওয়া হইত ও ভস্ম করা হইত। রৌপ্য খুব চক্‌চকে হইলে জানা যাইত যে, উহা শোধিত হইয়াছে। সীস ভস্ম হইয়া খর্পরে লাগিয়া যাইত। এই সীস ভস্ম (litharge) হিন্দুস্থানীতে "ফেরেল" ও ফার্সীতে "ফেন্নে" বলা হইত। *

আইন আকবরীতে এই খর্পরীকরণ ব্যতীত স্বর্ণ হইতে রৌপ্য আহরণ, উপরোক্ত সীসভস্ম হইতে রৌপ্য সংগ্রহ, তাম্র হইতে রৌপ্য পৃথক্‌করণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

রৌপ্যশোধন—উপরে বিশুদ্ধ রৌপ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়ার আলোচনা করা হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে রৌপ্যকে শোধিত করিবার জন্য রৌপ্যের পাতকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ যথাক্রমে তৈল, তক্র, কাঁজি প্রভৃতিতে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রক্রিয়া নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

রৌপ্যমারণ—দুইটি প্রক্রিয়া প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রথম প্রক্রিয়া।—"কণ্টকবেধ্য অতি সূক্ষ্ম রৌপ্যপত্র দ্বিগুণ পরিমিত

* আধুনিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা—"When the argentiferous lead is rich in silver, the alloy is submitted to *cupellation*, which consists in heating the metal in a reverberatory furnace, the hearth of which consists of a movable, oval-shaped shallow dish, made of bone-ash, known as a *cupel* or *test* The alloy is fed into this cupel from a melting pot and a blast of air is projected upon the surface of the molten metal. The lead is thus converted into litharge and the melted oxide by the force of the blast is made to overflow into iron pots. As the oxidation of the lead reaches completion...... leaving the brilliant surface of the melted silver" —Newth's Inorganic chemistry.

হিঙ্গুল দ্বারা লেপন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পাক করিলে উপরিস্থ হাঁড়ীর তলভাগে পারদ সংলগ্ন হইবে এবং নিম্নস্থ হাঁড়ীতে রৌপ্য ভস্ম পড়িয়া থাকিবে।" এই প্রক্রিয়ায় রৌপ্য হিঙ্গুলের গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হইয়া সিল্‌ভার সল্‌ফাইডে (Silver Sulphide) পরিণত হইবে এবং পাতনযন্ত্রে পারদ সংগৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।—"হরিতাল, গন্ধক ও রৌপ্যপত্র সমান পরিমাণে লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে পুরিয়া তিনবার পুটপাক করিয়া লইলে রৌপ্য ভস্ম হইয়া থাকে।" এখানেও রৌপ্য গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে সিল্‌ভার সল্‌ফাইড' (Silver Sulphide) প্রস্তুত হইবে।

মারিত রৌপ্যের রাসায়নিক পরীক্ষা

প্রথম নমুনা। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাতে আদৌ রৌপ্য নাই—কেবল তাম্র ছিল। উহা কপার সল্‌ফাইড (Copper Sulphide)।

দ্বিতীয় নমুনা। উহাও উপরোক্ত নমুনার মত কপার সল্‌ফাইড (Copper Sulphide)—রৌপ্য আদৌ নাই। এই দুইটি নমুনা কলিকাতার দুইটি বিভিন্ন বৃহৎ দোকানে হইতে ক্রীত হইয়াছিল। এরূপ হইবার একমাত্র কারণ হইতে পারে এই যে, বাজারে যাহা রুপুলি পাতা বলিয়া বিক্রীত হয়, তাহাই রৌপ্যের পাতা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবে। বলা আবশ্যক যে, এই সকল রুপুলি ও সোনালি পাতায় রূপা বা সোনা আদৌ নাই, উহারা তামা হইতে প্রস্তুত ও রং করা। আশা করি, রুপুলি পাতা লইয়া কেহ যেন রৌপ্য ভস্ম প্রস্তুত না করেন ; বিশুদ্ধ রৌপ্য হইতে পাত প্রস্তুত করাইয়া যেন তাহা হইতে রৌপ্যভস্ম প্রস্তুত করেন।

আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষা যতদিন আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত না হইবে, ততদিন এইরূপ নমুনা-বিভ্রাট ঘটিতে থাকিবেই থাকিবে।

তৃতীয় নমুনা—উপরোক্ত দুইটি নমুনা পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ রৌপ্য ভস্ম পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার আর একটি দোকান হইতে আর একটি নমুনা পাইয়াছি, তাহা বিশুদ্ধ রৌপ্যভস্ম। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণের গুঁড়া। পারদ বা আর্সেনিক নাই।

বালুকা ...	... ৩৮	শতকরা ভাগ।
রৌপ্য ...	... ৮০·৬	,,
গন্ধক ...	... ১৫·৬	,,
	১০০·০	

তাম্র নাই বলিলেই হয়। উহা সিল্ভার সল্ফাইড্, অসংযুক্ত গন্ধক থাকাতে রৌপ্যের ভাগ কিছু কম। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত রৌপ্য ভস্মকে সিলভার অক্সাইড বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

তাম্র।

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ধাতুপ্রস্তুত-প্রক্রিয়া—আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তাম্র (১) তুঁতে, (২) মাক্ষিক ও (৩) বিমল হইতে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হইত।

(১) তুত্থক (তুঁতে, copper sulphate)—"তুঁতের ওজনের চতুর্থাংশ সোহাগা মিশাইয়া করঞ্জের তৈলে একদিবস ভিজাইয়া রাখিবে। পরে বদ্ধমূষায় কাঠের কয়লার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এইরূপে ইন্দ্র-গোপের ন্যায় সুন্দর লালরঙ্গের সত্ত্ব (অর্থাৎ তাম্র) পাওয়া যাইবে।" *

(২) মাক্ষিক (pyrites)—বৈদ্যকে দুই প্রকার মাক্ষিকের উল্লেখ আছে—স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা যে দ্রব্য স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে তাম্র আদৌ নাই, লৌহ আছে। অতএব উহারা copper pyrites নহে, iron pyrites। এই মাক্ষিক লইয়া গোলমাল হইবার কারণ এই যে, তাম্র এবং লৌহ দুই ধাতুরই মাক্ষিক আছে। লৌহ মাক্ষিকের স্বর্ণ ও রৌপ্য সদৃশ প্রকারান্তর

---

* সস্যকস্য তু চূর্ণং তু পাদসৌভাগ্যসংযুতম্।
করঞ্জতৈলমধ্যস্থং দিনমেকং নিধাপয়েৎ॥
মধ্যস্থমন্ধমূষায়াং ধ্মাপয়েৎ কোকিলত্রয়ম্।
ইন্দ্রগোপাকৃতি চৈব সত্ত্বং ভবতি শোভনম্॥
রসরত্নসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়,—১৩৩—১৩৪।

আছে, এবং তাম্রের মাক্ষিকের রংও স্বর্ণের ন্যায়। এখন উভয়কে স্বর্ণমাক্ষিক বলিলে বস্তুনির্ণয়ে ভ্রান্তি আসিবে। এই ভ্রান্ত নিবারণ করিতে হইলে এই মাক্ষিকগুলির নামের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নিম্নলিখিত রূপে নামকরণ করিলে বস্তু নির্ণয়ের সুবিধা হইবে, নহিলে লৌহের স্থানে তাম্র, তাম্রের স্থানে লৌহ ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। "মাক্ষিক" শব্দ সাধারণ নাম থাকুক। মাক্ষিক দুই প্রকার—"তাম্রমাক্ষিক" (copper pyrites) এবং "লৌহমাক্ষিক" (iron pyrites)। প্রথমটিতে তাম্র ও লৌহ দুইই আছে, অপরটিতে কেবল লৌহ আছে। আবার বর্ণভেদে উহারা "শ্বেত" বা "পীত" পদবাচ্য হইবে, যথা—পীত বর্ণের লৌহমাক্ষিককে "পীত লৌহমাক্ষিক" এবং শ্বেতবর্ণের লৌহমাক্ষিককে "শ্বেত লৌহমাক্ষিক" বলা যাইবে। কোন্ মাক্ষিকে লৌহ বা তাম্র অথবা দুইই আছে, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির করিতে হইবে। ভাবপ্রকাশ * স্বর্ণমাক্ষিকে "কিঞ্চিৎ সুবর্ণ" ও রৌপ্যমাক্ষিকে "কিঞ্চিৎ রজত" আছে বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

তাম্রমাক্ষিক হইতে পুরাকালে নিম্নলিখিত উপায়ে তাম্র আহৃত হইত :—"মাক্ষিককে বারম্বার মধু, গন্ধর্ব্বের তৈল, গোমূত্র, ঘৃত এবং কদলীমূলের রসে নিষিক্ত করিয়া মূষার মধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ করিলে তাম্রের রং বিশিষ্ট সত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।" † এই উপায়ে অবশ্য বিশুদ্ধ তাম্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, কারণ, তাম্রমাক্ষিকে তাম্র ও লৌহ

---

* ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড—৪২৪ পৃঃ।

† ক্ষৌদ্রগন্ধর্ব্বতৈলাভ্যাং গোমূত্রেণ ঘৃতেণ চ।
কদলীকন্দসারেণ ভাবিতং মাক্ষিকং মুহুঃ।
মূষায়াং মুঞ্চতি ধ্মাতং সত্ত্বং শুল্বনিভং মৃদু॥
রসার্ণব, সপ্তম অধ্যায় ;—১২-১৩
ও রসরত্নসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়,—৮৯-৯০।

দুইই আছে। আজকালও তাম্রমাক্ষিক হইতে তাম্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই লৌহকে দূরীভূত করিবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

বিমল—কোন্ দ্রব্যকে বিমল বলা যাইতে পারে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। যখন বিমল হইতে তাম্র আহৃত হইত, তখন উহা তাম্রমূলক কোন খনিজ (ore) পদার্থ হইবে। কেহ কেহ উহাকে রৌপ্যমাক্ষিক বলিয়াছেন। * আমার মনে হয়, উহা copper glance নামক খনিজ পদার্থ। রসরত্নসমুচ্চয়কার বলিয়াছেন—বিমল তিন প্রকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের বর্ণযুক্ত। উহা গোলাকার, কোণসংযুক্ত এবং ফলকান্বিত। † এই বর্ণনা তাম্রমাক্ষিক ও copper glance এই দুই খনিজের সহিতেই কতক কতক মিলে। কিন্তু যখন তাম্রমাক্ষিকের স্বতন্ত্র নাম ও বর্ণনা রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, বিমল তাম্রমাক্ষিক নহে। অতএব উহাকে copper glance বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বিমল হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে তাম্র প্রস্তুত হইত :—

(ক) "বিমলকে সোহাগা, কুচের রস, এবং মেষশৃঙ্গীর ভস্মের সহিত পিশিয়া মূষার মধ্যে পাক করিলে স্বর্ণের রঙ্গের সত্ত্ব পাওয়া যায়।" ‡

---

* রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, বিমলশুদ্ধি,—৪০ পৃঃ।

† বিমলস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো হেমাদ্যস্তারপূর্ব্বকঃ।
তৃতীয়ঃ কাংস্যবিমলস্তত্তৎকান্ত্যা স লক্ষ্যতে॥
বর্ত্তুলঃ কোণসংযুক্তঃ স্নিগ্ধশ্চ ফলকান্বিতঃ।
রসরত্নসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়—৯৬-৯৭।

‡ সটঙ্কণকুচদ্রাবৈর্মেষশৃঙ্গ্যাশ্চ ভস্মনা।
পিষ্ট্বা মূষোদরে লিপ্তঃ সংশোষ্য চ নিরুধ্য চ॥
ষট্প্রস্থকোকিলৈর্ধ্মাতো বিমলঃ শীতসন্নিভঃ।

(খ) "বিমলকে ফটকিরি, হিরাকস, সোহাগা, শিগ্রবৃক্ষের রস, কদলীবৃক্ষের রসে নিষিক্ত করিয়া মোক্ষক বৃক্ষের ক্ষারের সহিত মিশাইবে, পরে বদ্ধমূষায় দগ্ধ করিলে চন্দ্রার্ক সদৃশ সত্ত্ব পাওয়া যায়।" *

এই সকল ধাতু প্রস্তুত প্রক্রিয়া অতি সংক্ষেপে দুই একটি সূত্রে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ ও রাসায়নিক ক্রিয়া অনুমান করা কঠিন। আমার বোধ হয়, যে সকল গাছ গাছড়ার রস এই সকল প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পুড়িয়া কেবল অঙ্গার (carbon) তাম্র প্রস্তুত কল্পে সহায়তা করে, এবং কদলী মেষশৃঙ্গী, শিগ্র বৃক্ষ পুড়াইয়া যে ক্ষার উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষারও (alkaline carbonate) উহার সহায়তা করে। অঙ্গার ও ক্ষার পদার্থ খনিজ দ্রব্য হইতে ধাতু প্রস্তুত কল্পে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তাম্রসংযোগে অগ্নিশিখার রং (flame colouration)—তাম্র বা তাহার কোনও যৌগিক অগ্নিশিখায় ধরিলে সেই শিখা নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়। রসরত্নসমুচ্চয়ও বলিয়াছেন - "শুল্বে নীলনিভা"।

তাম্রের শোধন—তাম্রকে "শোধিত" করিবার জন্য কয়েকটি মতান্তর প্রক্রিয়া আছে :—

(ক) "তাম্রের অতি সূক্ষ্ম পাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে, পরে উহা জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র এবং কুলত্থকলায়ের ক্বাথ, এই কয়েক দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে তিন তিন

সত্ত্বং মুঞ্চতি তদ্‌যুক্তো রসঃ স্যাৎ স রসায়নঃ ॥
ঐ, ১০১-১০২।

* বিমলং শিগ্রুতোয়েন কাঙ্ক্ষীকাসীসটংকণৈঃ।
বজ্রকন্দসমাযুক্তং ভাবিতং কদলীরসৈঃ ॥
মোক্ষকক্ষারসংযুক্তং ধ্মাপিতং মূকমূষগম্।
সত্ত্বং চন্দ্রার্কসংকাশং প্রযচ্ছতি ন সংশয়ঃ ॥ ঐ, ১০৩-১০৪।

বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়”। * এই প্রক্রিয়ায় তাম্রকে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিবার সময় তাম্র খানিকটা করিয়া কপার অক্সাইডে (Copper oxide) পরিণত হইবে। উহাকে তৈল, তক্র প্রভৃতিতে নিমজ্জিত করিবার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

(খ) “সৈন্ধব লবণ আকন্দক্ষীরসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাম্রপত্র লেপন করত অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে সাতবার করিলে তাম্র শোধিত হয়” †, এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে সম্ভবতঃ লবণসংযোগে কপার ক্লোরাইড (Copper chloride) প্রস্তুত হয়, পরে বার বার উত্তপ্ত করিলে কপার অক্সাইডে (Copper oxide) পরিণত হয়।

তাম্র মারণ—তাম্রকে সম্যক্‌রূপে মারিত না করিলে তাম্র বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। তাম্রকে মারিত করিবার কয়েকটি মতান্তর প্রক্রিয়া আছে। তাহার সকলটির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—তাম্রকে কপার সল্‌ফাইডে (Copper sulphide) পরিণত করা। সেই উদ্দেশ্যে তাম্রের খুব সূক্ষ্মপত্র উহার চারি অংশের এক অংশ পারদের সহিত মিলিত করিয়া দ্বিগুণ গন্ধকসংযোগে বেশ করিয়া পেষণ করিয়া দুইখানি সরার মধ্যে পুরিয়া মুখবন্ধ করত পুটপাক করা হয়। ভ্রান্ত্যাদি দোষ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ওলের মধ্যে পুরিয়া বারংবার পুটপাক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে—প্রথমে তাম্র ও পারদে মিলিত হইয়া (Copper amalgam) প্রস্তুত হয়। পরে গন্ধকসহযোগে কপার সল্‌ফাইড ও মার্কারি সল্‌ফাইডে পরিণত হয়। পুটপাককালে পারদ ও মার্কারি সল্‌ফাইড উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে এবং

---

* ভাবপ্রকাশ—তাম্রশোধন।

† রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—তাম্রশোধন।

সরার নিম্নে কপার সল্‌ফাইড পড়িয়া থাকে। বার বার পুটপাক করিবার অর্থ এই যে, অবিকৃত তাম্র যেন উহাতে না থাকে, সমস্ত তাম্রই যেন সল্‌ফাইডে পরিণত হয়। ওল কি জন্য ব্যবহৃত হয়, বুঝিতে পারি নাই।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—ডাঃ উদয়চন্দ্র দত্ত মারিত তাম্রের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা সল্‌ফাইড অব্ কপার (copper sulphide)। আমি দুইটি নমুনা পরীক্ষা করিয়াছি। দেখিতে খুব কাল। উহারা কিউপ্রাস্ সল্‌ফাইড্ (cuprous sulphide), কিউপ্রিক্ সল্‌ফাইড (cupric sulphide) নহে।

তাম্রপর্প্টী।

"পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্রভস্ম ১ ভাগ একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক লৌহনির্ম্মিত হাতায় ঘৃতসহ গলাইয়া গোবরের উপরে কলার পাতা পাতিয়া তদুপরি উক্ত গলিত পদার্থ ঢালিয়া গোময়পূরিত কদলীপত্রের পুটুলী দ্বারা চাপিয়া পর্প্টী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর উহা চূর্ণ করিয়া বামনহাটী, মুণ্ডিরী, বকফুলের পাতা, ত্রিফলা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, ঘৃতকুমারী, আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসের দ্বারা সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া তাম্রনির্ম্মিত খর্পরে করিয়া গন্ধক দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পুটপাক করিয়া লইবে।" * এই উপায়েও কিউপ্রাস্ সল্‌ফাইড (cuprous sulphide) প্রস্তুত হইবে, পারদ উর্দ্ধগামী হইয়া যাইবে এবং গাছ গাছড়া পুড়িয়া কিঞ্চিৎ ভস্মে (ash) পরিণত হইবে। অধ্যাপক রায় মহাশয় তাম্রপর্প্টীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে প্রায় বিশুদ্ধ কিউপ্রাস্ সল্‌ফাইড বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। †

---

* রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—তাম্রপর্প্টী,—২০৮ পৃঃ।

† Ray: History of Hindu Chemistry, Vol. I., p. 144.

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বঙ্গ (Tin)

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শুক্লযজুর্ব্বেদ ও মনুসংহিতাতে "ত্রপুর" উল্লেখ আছে। রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু, পিচ্চট এই কয়টি বঙ্গের পর্য্যায়। সুশ্রুতের সময় হইতে যে ছয়টি ধাতু আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে বঙ্গ অন্যতম। সুপ্রসিদ্ধ মেগাস্থিনিস্ (Megasthenes) তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আইন আকবরীতে দেখিতে পাই যে পঞ্জাবের নদীসকলের বালুকা হইতে অন্যান্য ধাতুর সহিত বঙ্গও পাওয়া যাইত। টেভার্নিয়ার (Tavernier) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (Metallurgy)—বঙ্গের প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার বিস্তৃত উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। ইউরোপে প্রাচীনকাল হইতে টিন্‌ষ্টোন (Tinstone) নামক খনিজ পদার্থ হইতে বঙ্গ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গের টিন্‌ষ্টোন ভিন্ন অন্য খনিজ পদার্থ সচরাচর মিলে না। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে যখন ত্রপু ও বঙ্গের ভূরি উল্লেখ দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই এই টিন্‌ষ্টোন হইতে বঙ্গ উৎপন্ন হইত। টিন্‌ষ্টোন দেখিতে শ্বেতবর্ণ, কিন্তু ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ আজ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। রসরত্নসমুচ্চয়ে "গৌরীপাষাণ" নামক একটি খনিজপদার্থের উল্লেখ সাধারণ রসবর্গের মধ্যে দেখা যায়। আমার মনে হয় যে এই গৌরীপাষাণই টিন্‌ষ্টোন। ইহার স্বরূপবর্ণনায় দেখিতে

পাই যে উহা "স্ফটিকাভ", "শঙ্খাভ" ও "হরিদ্রাভ" এবং উহার সত্ত্বও (অর্থাৎ বঙ্গ) "শুদ্ধ শুভ্র"। *

তাহা হইলে গৌরীপাষাণ যদি টিন্‌ষ্টোন হয়, রসরত্নসমুচ্চয়ের মতে উহার সত্ত্বপাতনবিধি হরিতালের সত্ত্বপাতনবিধির অনুরূপ। টিন্‌ষ্টোন হইতে বঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইলে উহার সহিত কয়লা মিশ্রিত করিয়া অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করিতে হয়। হরিতালের সত্ত্বপাতনবিধিতে যে "ষোড়শিকাতৈলের" সহিত মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, † তাহাতে উৎপন্ন অঙ্গার (carbon) সংযোগে গৌরীপাষাণ বঙ্গে পরিণত হইতে পারে।

বঙ্গের শোধন—বঙ্গ খুরক ও মিশ্রক ভেদে দুই প্রকার। খুরক বঙ্গ বিশুদ্ধ এবং মিশ্রক সীসকসংযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। খুরক বঙ্গ "ধবল, মৃদুল, স্নিগ্ধ, দ্রুতদ্রাব ও সগৌরব" এবং ইহাকে আঘাত করিলে শব্দ হয় না। অপর পক্ষে মিশ্রক বঙ্গ "শ্যামশুভ্র"। বঙ্গের শোধন সীসক ও যশদের মত। ভাবপ্রকাশের মতে বঙ্গ অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া

---

* স্ফটিকাভশ্চ শঙ্খাভো হরিদ্রাভস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
তালবৎ বাহয়েৎ সত্ত্বং শুদ্ধং শুভ্রং প্রযোজয়েৎ॥
রসরত্নসমুচ্চয়। তৃতীয় অধ্যায়।

"স্ফাটিকাভ"—Cf "tinstone or cassiterite crystallising in the quadratic system and possessing an adamantine lustre"—Roscoe and Schorlemmer's Treatise on Chemistry, Vol. II, Part II.

† পলালকং রবেদুগ্ধৈর্দিনমেকং বিমর্দয়েৎ।
ক্ষিপ্তা ষোড়শিকাতৈলে মিশ্রয়িত্বা ততঃ পচেৎ॥
অনাবৃতপ্রদেশে চ সপ্তযামাবধি ধ্রুবম্।
স্বাঙ্গশীতমধস্থং চ সত্ত্বং শ্বেতং সমাহরেৎ॥
রসরত্নসমুচ্চয়, তৃতীয় অধ্যায়।

তৈল, তক্র প্রভৃতিতে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়। এই শোধনপ্রক্রিয়া নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গের মারণ— নিম্নলিখিত মারণপ্রক্রিয়াই প্রশস্ত। "শোধিত বঙ্গপত্র একটি লৌহময় হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া উনানে বসাইয়া অগ্নিদ্বারা জ্বাল দিবে; বঙ্গ গলিয়া যাইলে উহাতে সমান পরিমাণ আপাংক্ষার পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত স্থূলাগ্র লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে; তৎপরে ভস্ম হইলে উহা জলে উত্তমরূপে ধৌত করত অঙ্গারাদি হীন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় দুগ্ধসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক শরাবসংপুটে তীক্ষ্ণ অগ্নিদ্বারা পুটপাক করিবে। ইহাতে বঙ্গ নিশ্চয়ই মারিত হইবে।" * এই মারণ-প্রক্রিয়ায় প্রথমে ক্ষার সংযোগে বঙ্গ কার্ব্বনেটে (carbonate) পরিণত হইবে, পরে উত্তাপ সংযোগে টিন্ আক্সাইড (tin oxide) প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইলে অবশিষ্ট ক্ষার দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

মারিত বঙ্গের রাসায়নিক বিশ্লেষণ— প্রথম নমুনা। দেখিতে শ্বেতাভ, খুব ধব্‌ধবে সাদা নহে। অসংযুক্ত বঙ্গ নাই। বালুকা (silica) মিশ্রিত আছে। নচেৎ বেশ বিশুদ্ধ টিন্ অক্সাইড (tid oxide)। জলে দ্রবণীয় অংশ খুবই কম।

দ্বিতীয় নমুনা। দেখিতে ধূসরবর্ণ। উহাতে টিন্ অক্সাইড ছাড়া সীসক (oxide of lead) যথেষ্ট ছিল। বেশ বুঝা যায় যে, এই নমুনাতে প্রথমে বিশুদ্ধ বঙ্গ না লইয়া বাজারের রাং ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজারের রাং বলিয়া যাহা বিক্রীত হয় তাহা বিশুদ্ধ বঙ্গ নহে, উহা বঙ্গ ও সীসক এই দুই ধাতুর মিশ্রিত দ্রব্য। বঙ্গ বলিয়া রাং যেন কেহ ব্যবহার না করেন।

---

* রসেন্দ্রসারসংগ্রহ,—বঙ্গ মারণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সীসক (Lead)

প্রাচীন ইতিহাস—সীসকের ব্যবহার বৈদিককাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এমন কি অথর্ব্ববেদের নানাস্থানে সীসের মাদুলি ধারণের ব্যবস্থা আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদে ও মনুতে সীসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় যুগে সীস সুশ্রুতের সময় হইতে ধাতু মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আইন আকবরীপাঠে জানা যায় যে দিল্লীসুবার অধীনে কুমায়ুন সরকারে অন্যান্য ধাতুর সহিত সীসও উৎপন্ন হইত এবং পঞ্জাবের নদীসমূহের বালুকা হইতেও সীসক সংগৃহীত হইত।

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (metallurgy)—সীস ধাতুর প্রধান খনিজ পদার্থ (ore) হইতেছে অঞ্জন (gaeena)। বৈদ্যকে নানাবিধ অঞ্জনের উল্লেখ আছে—সৌবীরাঞ্জন, স্রোতোঽঞ্জন, রসাঞ্জন ইত্যাদি। এই সকল অঞ্জনের বস্তু নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। এই মতভেদ পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মদনপালনির্ঘণ্টুমতে "সৌবীরাঞ্জনম্ কৃষ্ণম্" এবং ভাবপ্রকাশমতে "স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্।" আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা সৌবীরাঞ্জনকে শ্বেতসূর্ম্মা ও স্রোতোঽঞ্জনকে কৃষ্ণসূর্ম্মারূপে ব্যবহার করেন। এখানে স্রোতোঽঞ্জনই কৃষ্ণসূর্ম্মারূপে উল্লিখিত হইবে।

এই কৃষ্ণসূর্ম্মা হইতে কি প্রকারে সীস ধাতু আহৃত হইত তাহা এপর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। এখানে সীস ধাতুর প্রস্তুতপ্রক্রিয়া স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটি অনেকটা

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তাহার সন্দেহ নাই। রসরত্নসমুচ্চয়কার বলিয়াছেন "অঞ্জনবর্গ হইতে সত্ত্বপাতন মনঃশিলার সত্ত্বপাতনের অনুরূপ"।* মনঃশিলার সত্ত্বপাতন প্রক্রিয়ায় দেখিতে পাই যে তাহার সহিত অষ্টমাংস কিট্ট, (মণ্ডূর বা লৌহের মরিচা) গুড়, গুগ্‌গুলু ও মাখন মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠী-যন্ত্রে উত্তপ্ত করিলে তাহার সত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। † অতএব কৃষ্ণসূর্ম্মা হইতেও এই প্রক্রিয়ায় সীসধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইত। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে গুগ্‌গুলু, গুড় প্রভৃতি জৈব পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া অঙ্গারে (carbon) পরিণত হইবে এবং মণ্ডূর অঙ্গারের সহিত উত্তপ্ত হইয়া লৌহধাতুতে পরিণত হইবে। পরে এই লৌহধাতু কৃষ্ণসূর্ম্মাকে সীসধাতুতে পরিণত করিবে। বদ্ধ কোষ্ঠীযন্ত্রে উত্তপ্ত হওয়াতে উপরিস্থ উত্তপ্ত কলসী হইতে গলিত সীসধাতু নিম্নস্থ শীতল কলসী মধ্যে পতিত হইবে। অধুনাও সীস-ধাতু কৃষ্ণসূর্ম্মাকে লৌহ ও অঙ্গার সংযোগে উত্তপ্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ‡

সীসকের শোধন—ভাবপ্রকাশমতে সীসককে অগ্নিতে গলাইয়া তৈল, তক্র প্রভৃতি দ্রবপদার্থে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিয়া শোধিত করিবার ব্যবস্থা আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে সীসক শোধনের নিম্নলিখিত

* মনোহ্বাসত্ত্ববৎ সত্ত্বমঞ্জনানাং সমাহরেৎ।

† অষ্টমাংশেন কিট্টেন গুড়গুগ্‌গুলুসর্পিষা
কোষ্ঠ্যাং রুদ্ধ্বা দৃঢ়ং ধ্মাত্বা সত্ত্বং মুঞ্চেন্মনঃশিলা।
রসরত্নসমুচ্চয়। ২য় অধ্যায়।

‡ "This method of lead smelting depends upon the fact that at a high temperature, metallic *iron*, in contact with lead sulphide is converted into ferrous sulphide with separation of lead. The ores... are smelted in a blast-furnace with coke and *either* metallic iron or such materials as will yield iron under the furnace conditi-on''s—Newth's Inorganic chemistry.

প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। "একটী হাঁড়িতে আকন্দের ক্ষীর রাখিয়া তদুপরি আর একটি সছিদ্র হাঁড়ি রাখিয়া দিবে। অনন্তর সীসা বা বঙ্গ অগ্নিসংযোগে গলাইয়া সছিদ্র হাঁড়িতে ঢালিয়া দিলে উহা ছিদ্র দ্বারা আকন্দক্ষীর সংযুক্ত নিম্নস্থ হাঁড়িতে পড়িবে। এই প্রকার তিন তিনবার করিলে সীসক ও রাং বিশোধিত হইবে।" এই দুইটি প্রক্রিয়াই নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

সীসক মারণ—সীসক মারণের কয়েকটি মতান্তর প্রক্রিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে সচরাচর যে দুইটি প্রক্রিয়া প্রচলিত তাহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রথম প্রক্রিয়া। - একটি মৃত্তিকাপাত্রে সীস স্থাপন করত অগ্নিসংযোগে দ্রব করিয়া উহার চারি অংশ তেঁতুলবৃক্ষের ও অশ্বত্থবৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ অগ্নির উপরে রাখিয়া এক প্রহর কাল লোহার হাতা-দ্বারা চালনা করিলেই সীসা ভস্ম হইবে। অনন্তর ঐ ভস্মের সমপরিমাণ মনঃশিলা মিলিত করত দ্বিগুণ কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে শীতল হইলে পুনর্ব্বার কাঞ্জি ও মনঃশিলার সহিত মর্দ্দন করত পুটপাক করিবে, এই প্রকারে ষাটবার পাক করিলে সীস মারিত হয়।* এই প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে। প্রথমে সীসক তেঁতুল ও অশ্বত্থবৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ সংযোগে লেড্ কার্ব্বনেটে (lead carbonate) পরিণত হইবে। তৎপরে কাঞ্জি সংযোগে আংশিক ভাবে লেড্ এসিটেটে (lead acetate) পরিণত হইবে। মনঃশিলা উত্তাপ সংযোগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া যাইবে। উত্তাপ সংযোগে লেড্ কার্ব্বনেট ও লেড্ এসিটেট ক্রমে লেড্ অক্‌সাইডে (lead oxide বা litharge) পরিণত হইবে।

* ভাবপ্রকাশ—সীসমারণ।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। – বক ফুলের পাতা পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সীসকপত্র লেপন করিয়া একটি হাঁড়ির ভিতরে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তন্মধ্যে সীসার চতুর্থাংশ বাসক ও আপাংক্ষার পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্ব্বক বাসকের দণ্ডদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিয়া পুনরায় বাসকের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক সাতবার পুটপাক করিলে সীসক নিশ্চয়ই মৃত হইয়া সিন্দূরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। * এই প্রক্রিয়ায় আপাংক্ষার সংযোগে প্রথমে লেড্ কার্ব্বনেট (lead carbonate) উৎপন্ন হইবে এবং উহা অধিক উত্তাপ সংযোগে প্রথমে লিথার্জ (litharge) পরে রেড্ লেড্ (red lead) অর্থাৎ মেটে সিন্দূরে পরিণত হইবে।

মারিত সীসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ—মারিত সীসের নমুনা লইয়া বড়ই গোলে পড়িলাম। একটি নমুনা শ্বেত, অপরটি হরিদ্রাভ, তৃতীয়টি লোহিত, চতুর্থ টি শ্বেত। প্রথম নমুনা।—দেখিতে ঈষৎ শ্বেত সূক্ষ্ম গুঁড়া। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা ১০ ভাগ হইবে। লেড্ কার্ব্বনেট (lead carbonate) ইহার অধিকাংশ ভাগ। অসংযুক্ত সীসও বেশ আছে। জলে দ্রবণীয় অংশে পোটাসিয়ম কার্ব্বনেটই বেশী, ক্লোরাইড ও ফস্ফেট খুব কম। বালুকাও আছে। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্তও কার্ব্বনেট অব লেড্ পাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় নমুনা।—দেখিতে হরিদ্রাভ। কার্ব্বনেট নাই। প্রায় সমস্তটাই লেড্ অক্সাইড (litharge)। অসংযুক্ত সীসক নাই। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা ৩।৪ ভাগ—পোটাসিয়ম কার্ব্বনেট, ক্লোরাইড ও ফস্ফেট।

তৃতীয় নমুনা।—দেখিতে লোহিতবর্ণ। মেটে সিন্দূর, বিলাতি দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ নমুনা।—দেখিতে ঈষৎ শ্বেত। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল প্রায় প্রথমটির মত।

বৈদ্যকের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে শাস্ত্রকারেরা সীস মারিত করিয়া লেড্ অক্‌সাইড প্রস্তুত করিতেন। আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দের নমুনায় কোনটি কার্ব্বনেটই আছে—অক্‌সাইডে পরিণত হয় নাই। আমার মনে হয়, যে সীস হরিদ্রাভ বা লোহিতাভ তাহাই সম্যক্ মারিত সীস, নচেৎ ঈষৎ শ্বেতবর্ণের মারিত সীসে অসংযুক্ত সীসও থাকিতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যশদ (Zinc)।

প্রাচীন ইতিহাস—বৈদিক গ্রন্থে ও আয়ুর্ব্বেদীয় যুগের গ্রন্থসমূহে যশদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে যশদ পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগে ধাতু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। প্রথমে যশদ রসক (Calamine) হইতে প্রস্তুত হইত এবং দেখিতে বঙ্গের (Tin) মত বলিয়া নাগার্জ্জুনকৃত রসরত্নাকর, রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে "রসকসত্ব" ও "বঙ্গাভ" বলিয়া কথিত হইত। মদনপাল-নির্ঘণ্টুতে উহা 'জসদ' নামে স্বতন্ত্র ধাতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নির্ঘণ্টু ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।* শার্ঙ্গধর তাঁহার সংগ্রহগ্রন্থে (১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত) নয়টি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থেও যশদের উল্লেখ নাই। তাঁহারই প্রায় সমকালীন সময়ে রচিত রসেন্দ্রচিন্তামণি ও রসেন্দ্রসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থদ্বয়েও ধাতুবর্গের মধ্যে যশদের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ভাবমিশ্রের ভাব-প্রকাশে আমরা যশদের ধাতুমধ্যে স্থান ও জারণ, মারণ, প্রভৃতির বেশ বিস্তৃত বিবরণ পাইয়া থাকি।† শার্ঙ্গধর ও রসেন্দ্রচিন্তামণি

* Ray : History of Hindu Chemistry Vol. I. p. 86. "জসদং বঙ্গসদৃশং দিতিহেতুশ্চ তন্মতম্" মদনপালনির্ঘণ্টু।

† ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৬২৪ পৃঃ।

ধাতুবর্গের মধ্যে যশদকে স্থান না দিলেও খর্পরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শার্ঙ্গধর ভূনাগ (খর্পর) হইতে সত্ত্বপাতন বিধিও বর্ণনা করিয়াছেন *।

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (metallurgy) – তান্ত্রিকগ্রন্থসমূহ পাঠে বেশ বুঝা যায় যে রসক হইতেই যশদ প্রস্তুত হইত। রসক খর্পর নামেও অভিহিত হইত। অনেকে খর্পরকে যশদ ধাতু বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। খর্পর যে তুত্থকের ভেদ মাত্র এবং রসকেরই অন্য নাম তাহা ভাবপ্রকাশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন। † নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, রসরত্নসমুচ্চয়কার রসক ও খর্পর একই দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রসক হইতে যশদের প্রস্তুতপ্রণালী নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ের বর্ণনা এত সুন্দর যে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেরও উপযুক্ত হইতে পারে। এস্থলে রসরত্নসমুচ্চয় হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"হরিদ্রা, ত্রিফলা, ধূনা, লবণ, গৃহধূম, সোহাগা, চতুর্থাংশ সারুষ্কর, অম্লরসের সহিত খর্পরকে বেশ করিয়া মর্দ্দন করিয়া বৃন্ত সংযুক্ত মূষার

---

* শার্ঙ্গধরসংগ্রহ, উমেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সংস্করণ, ৪৬ পৃঃ ॥

† খর্পরীতুল্যং তুত্থান্তত্রসকং স্মৃতম্—ভাব প্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড ৪৩৭ পৃঃ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের অনুবাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর খর্পরকে দস্তা করিয়াছেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে বলিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও খর্পর মারণকালে অগ্নির উত্তাপে যখন উহাকে গলান হইয়াছে, তখন উহা রসক না হইয়া যশদ হওয়াই খুব সম্ভব। ধাতুরত্নমালাতেও এইরূপ খর্পর ও যশদ সম্বন্ধে গোল আছে। বেশ বুঝা যায় যে ভাবপ্রকাশের আগে যশদ ধাতু মধ্যে স্থান পাইবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও দ্বারা খর্পর বলিয়া অভিহিত হইত।

(tubulated retort) ভিতরে লেপ দিবে। পরে শুষ্ক করিয়া আর একটি মূষার দ্বারা ঢাকা দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। যখন মূষার মুখ হইতে বহির্গত অগ্নিশিখা নীলবর্ণ হইতে শ্বেতবর্ণ হইবে, তখন মূষাকে সাঁড়াশীর দ্বারা অধোমুখে ধারণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মাটিতে ঝাড়িবে। এইরূপে বঙ্গসদৃশ সত্ত্ব পতিত হইবে। নাড়িবার সময় সাবধান হইতে হইবে যে মূষার নাল (tube) ভাঙ্গিয়া না যায়।"*

উপরোক্ত যশদ প্রস্তুতপ্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথমে রসক অর্থাৎ জিঙ্ক্ কার্ব্বনেট্ (Zinc Carbonate) উত্তপ্ত হইয়া জিঙ্ক্ অক্সাইডে (Zinc Oxide) পরিণত হয়। পরে উহা অঙ্গারমূলক গৃহধূম (Soot) সংযোগে যশদে পরিণত হইয়া থাকে এবং কার্ব্বন মনক্সাইড্ (Carbon Monoxide) নামক দাহ্য গ্যাস বাহির হইতে থাকে। এই গ্যাস মূষার বৃন্তের উপর নীলাভ শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলে। যখন উত্তাপ এত বেশী হয় যে যশদ বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া এই নীলাভ শিখাকে শ্বেতবর্ণ শিখায় পরিণত করে, তখনই বুঝিতে হইবে যে রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইয়াছে এবং মূষার ভিতর হইতে তরল যশদ ঢালিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনকালের

---

* হরিদ্রাত্রিফলারাল সিন্ধুধূমৈঃ সটঙ্কণৈঃ ॥
সারুষ্করৈশ্চ পাদাংশৈঃ সাম্লৈঃ সংমর্দ্য খর্পরম্।
লিপ্তং বৃন্তাকমূষায়াং শোষয়িত্বা নিরুদ্ধ্য চ ॥
মূষাং মূষোপরি ন্যস্য খর্পরং প্রধমেৎ ততঃ।
খর্পরে প্রহৃতে জ্বালা ভবেন্নীলা সিতা যদি ॥
তদা সন্দংশতো মূষাং ধৃত্বা কৃত্বা ত্বধোমুখীম্।
শনৈরাস্ফালয়েদ্ভূমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে ॥
বঙ্গাভং পতিতং সত্বং সমাদায় নিয়োজয়েৎ ॥
রসরত্নসমুচ্চয় দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহে নানাবিধ গাছ গাছড়া অনাবশ্যকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেও হইয়াছে। উহারা পুড়িয়া কেবল অঙ্গারে পরিণত হয় এবং সেই অঙ্গার ধাতুপ্রস্তুত-প্রক্রিয়ার সহায়তা করে মাত্র, উহাদের দ্বারা অন্য রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। এই প্রক্রিয়া এস্থলে এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে স্বতঃই মনে হয় যে গ্রন্থকার নিজে প্রক্রিয়া দেখিয়াই লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রক্রিয়া মাত্র দুই একটি শ্লোকে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। আজ কালও যশদ এইরূপ ভাবেই রসক হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে নানাপ্রকার অনাবশ্যক গাছ গাছড়া ব্যবহার না করিয়া দুই ভাগ রসক ও এক ভাগ কয়লার গুঁড়া বৃন্তসংযুক্ত বদ্ধমূষায় উত্তপ্ত করা হয়।

যশদ শোধন—যশদের শোধন ও মারণ বঙ্গের ন্যায়। ভাবপ্রকাশে যশদকে অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিয়া তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র, কুলথকলায়ের ক্বাথ এবং আকন্দের আটা এই কয়েকটী দ্রব্যে যথাক্রমে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে।* এই শোধন প্রক্রিয়ার যে কি আবশ্যক কিছু বুঝিলাম না। যশদকে উত্তপ্ত করিবার সময় খানিকটা যশদ জিঙ্ক্ অক্সাইডে (Zinc Oxide) পরিণত হইতে পারে। সে কার্য্য পরবর্ত্তী মারণপ্রক্রিয়ায় সাধিত হইবে।

যশদ মারণ—একটি মৃত্তিকানির্ম্মিতপাত্রে যশদ গলাইয়া তাহার চারি অংশের এক অংশ তেঁতুল বৃক্ষের ও অশ্বত্থবৃক্ষের ত্বক্ চূর্ণ করত উহাতে নিক্ষেপ করিয়া লৌহের হাতাদ্বারা চালনা করিবে, দুই প্রহর অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া এইরূপ চালনা করিলেই যশদ ভস্ম হইবে। তৎপরে উক্ত ভস্মের সমপরিমাণ হরিতাল উহাতে নিক্ষেপ করত অম্লদ্বারা

* ভাব প্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৬২৩ পৃঃ।

মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পুনরায় অম্লদ্বারা মর্দ্দন করত দশ অংশের এক অংশ হরিতালসহ এক প্রহরকাল পুটে পাক করিবে। এই প্রকার দশবার পাক করিলেই যশদ মারিত হইবে।*

উপরোক্ত মারণ প্রণালীতে নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। গলিত যশদকে বায়ু সংযোগে দ্বিপ্রহর কাল উত্তপ্ত করিয়া নাড়িতে থাকিলে ক্রমে জিঙ্ক্ অক্সাইডে (Zinc Oxide) পরিণত হইবে। তেঁতুল ও অশ্বত্থবৃক্ষের ছালচূর্ণের কি প্রয়োজন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ঐ চূর্ণ উত্তাপসংযোগে কার্ব্বনেটে পরিণত হয় এবং সেই কার্ব্বনেট যশদকে জিঙ্ক্ কার্ব্বনেট (Zinc Carbonate) ও পরে জিঙ্ক্ অক্সাইডে পরিণত করিতে সহায়তা করে। হরিতাল সংযোগে পুটপাক কালে প্রায় সমস্ত হরিতালই ঊর্দ্ধগামী হইয়া যায়।

মারিত যশদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঃ—দেখিতে শ্বেতবর্ণের অথবা ঈষৎ ধূসর বর্ণের গুঁড়া। অসংযুক্ত যশদ (Free Zinc) নাই। আর্সেনিক ঈষৎ আছে। বালুকার ভাগ কিছু বেশী। অধিকাংশ ভাগই জিঙ্ক্ অক্সাইড (Zinc Oxide)। অঙ্গারজনিত পদার্থ (Organic matter) নাই। জলে দ্রবণীয় অংশে পোটাশিয়াম (Potassium) ঘটিত যৌগিক আছে—ক্লোরাইড (Chloride) কার্ব্বনেট্ (Carbonate ও ফস্ফেট (Phosphate)। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা .৩।৪ ভাগ মাত্র। তবেই দেখা গেল মারিত যশদ প্রধানতঃ জিঙ্ক্ অক্সাইড, বাকি সকল পদার্থ তেঁতুল ও অশ্বত্থ বৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ ব্যবহারের জন্য আসিয়াছে। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত লিখিয়াছেন যে তিনি যে মারিত যশদের নমুনা পাইয়াছিলেন তাহাতে জিঙ্ক্ কার্ব্বনেট ও জিঙ্ক্ সিলিকেট পাইয়াছিলেন (Dutt, Materia Medica of the Hindus, p.71).

* ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৬২৩ পৃঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পারদ (Mercury.)

প্রাচীন ইতিহাস—বৈদিক গ্রন্থ-সমূহে পারদের উল্লেখ আছে কি না সঠিক অবগত নহি। গ্রীসদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পারদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন শতাব্দীতে থিওফ্রাষ্টস্ (Theophrastus) "তরল রৌপ্যের" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডাইওস্করাইডিস্ (প্রথম খ্রীষ্টাব্দী) হিঙ্গুল ও কয়লা একত্র মিশ্রিত করিয়া পাতনযন্ত্রে উত্তপ্ত করিয়া পারদ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে আমরা সুশ্রুতে পারদের উল্লেখ দেখিতে পাই।* বাগভটে অঞ্জন প্রস্তুতকালে "রসেন্দ্র" অর্থাৎ পারদ ব্যবহৃত হইয়াছে।† অতএব বৈদ্যকশাস্ত্রে বাগভটের সময় পর্য্যন্ত পারদের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রচলিত হয় নাই। পারদের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ রসরত্নাকরে প্রথম দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই গ্রন্থখানি সপ্তম শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থে পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী এবং রসপর্প্পটিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে‡

* রক্তং শ্বেতং চন্দনং পারদঞ্চ কাকোল্যাদিঃ ক্ষীরপিষ্টশ্চ বর্গঃ।

† রসেন্দ্রভুজগৌ তুল্যৌ তয়োস্তুল্যমথাঞ্জনম্।

ঈষৎ কর্পূরসংযুক্তমঞ্জনং নয়নামৃতম্॥ বাগ্‌ভট (বিনোদলাল সেনগুপ্ত), উত্তরার্দ্ধ ২৭৫ পৃঃ।

‡ সূতকস্য পলং গৃহ্যং তুর্য্যাংশং সাক্ষুকঃ বিষম্।
তৎসমং গন্ধকং শুদ্ধং চূর্ণং কৃত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
কৃত্বা কজ্জলিকামাদৌ পলং দত্বা চ গন্ধকম্।
ঘৃতপকক্কতচ্চূর্ণং পচেদায়সভাজনে॥

এবং স্বর্ণ, পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া অন্ধমূষায় লঘুপুটে পাক করিয়া স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত করিবারও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত "সাধকেন্দ্র" ভক্ষণ করিলে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * রসরত্নাকর নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত না হইলেও এবং সপ্তম শতাব্দীর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ হইলে ঐ শতাব্দীতে কজ্জলী, রসপর্পটিকা ও স্বর্ণসিন্দুর আবিষ্কৃত ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। রসত্নাকরের পর বৃন্দের সিদ্ধযোগে একভাগ গন্ধক ও অর্দ্ধভাগ পারদ মিশ্রিত করিয়া "রসামৃতচূর্ণ" প্রস্তুত করিবার বিধি আছে। বৃন্দ চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী, কিন্তু অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিদ্ধযোগের একখানি সংস্করণে "রসামৃতচূর্ণের" উল্লেখ পান নাই, কেবল কাশ্মীর হইতে আনীত পাণ্ডু-লিপিতে পাইয়াছেন। বৃন্দের পর চক্রপাণি একভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা গলাইয়া রসপর্পটী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই প্রস্তুতপ্রণালী অনেকটা রসরত্নাকরে উল্লিখিত প্রস্তুতপ্রণালীর সহিত মিলে। কিন্তু চক্রপাণি লিখিয়াছেন "রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা।" এক্ষেত্রে আমরা চক্রপাণিকে কজ্জলী ও রসপর্পটিকার আবিষ্কর্ত্তা না বলিয়া বৈদ্যকশাস্ত্রে উহাদের প্রচলয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। রসরত্নাকরের মতে উহাদের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রয়োগকর্ত্তা নাগার্জ্জুন।

যাবদ্দ্রবত্বমায়াতি তৎক্ষণাৎ তং বিনিক্ষিপেৎ।
পুটে বা কদলীপত্রে সিদ্ধং পর্প্পটিকারসম্॥

রসরত্নাকর।

---

* রসং হেমসমং মর্দ্যং পীটিকাগিরিগন্ধকম্।
দ্বিপদীরজনীরম্ভাং মর্দ্দয়েৎ টঙ্কণান্বিতাম্॥
নষ্টপিষ্টঞ্চ মুক্তঞ্চ অন্ধমূষ্যাং নিধাপয়েৎ।
তুষাল্লঘুপুটং দত্ত্বা যাবস্তম্মত্বমাগতঃ।
ভক্ষণাৎ সাধকেন্দ্রস্তু দিব্যদেহমবাপ্নুয়াৎ॥

পারদের বহুল প্রয়োগ পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থাবলীতেই দৃষ্ট হয়। এমন কি শতকরা নব্বইটি ধাতুঘটিত ঔষধ পারদযুক্ত। অধিকন্তু "রসায়ন" শাস্ত্র রস বা পারদের নাম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে যদিও রসগ্রন্থসমূহে অন্যান্য ধাতুর সহিত পারদঘটিত ঔষধের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, কিন্তু পারদ ধাতুবর্গের মধ্যে স্থান পায় নাই তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় যে পারদ তরল পদার্থ এবং অন্যান্য ধাতু কঠিন দ্রব্য। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে ভাবপ্রকাশ যদিও পারদকে ধাতুবর্গের মধ্যে স্থান দেন নাই, তবুও পারদকে "ধাতু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

অবৈদ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও পারদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় পারদ "শুক্রবৃদ্ধিযোগে" স্থান পাইয়াছে। † বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে

---

* রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।

ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ। ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব খণ্ড। ইউরোপেও পারদ সহজে ধাতু বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই—"Basil Valentine and Agricola both regarded mercury as a metal, but Libavius placed it amongst those "quœ metallis sunt affinis," thus connecting it with bismuth, arsenic, galena, cinnabar, and other bodies. Even at a later date were held similar views; thus Brandt in 1735 speaks of it as a semi-metal, indeed it was not reckoned as a true metal until Braunne of St. Petersburgh, in the winter of the year 1759, found that it solidifies when exposed to a freezing mixture of snow and nitric acid"—Roscoe, and Scharlemmer, Treatise on Chemistry, Mercury.

† মাক্ষীকধাতুমধুপারদলৌহচূর্ণ-
পথ্যাশিলাজতুঘৃতানি সমানি যোঽদ্যাৎ।
সৈকানি বিংশতিরহানি জরান্বিতোঽপি
সোঽশীতিকোঽপি রময়ত্যবলাং যুবেব॥ বৃহৎসংহিতা, কান্দর্পিকম্।

বেশ বুঝা যাইতেছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই পারদসেবনের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। পারদসেবনের এই প্রমাণটিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে রসরত্নাকরের মতে নাগার্জ্জুন (দ্বিতীয় শতাব্দী) কজ্জলীর আবিষ্কারক ও প্রয়োগকর্ত্তা। বৃহৎসহিতার এই বচন উহার সমর্থন করিতেছে।

অমরসিংহের (ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী) অমরকোষে পারদের উল্লেখ। আছে এবং 'চপল,' 'রস' ও 'সূত' শব্দ পারদের প্রতিশব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহেশ্বর (দ্বাদশ শতাব্দী) কৃত 'বিশ্বকোষ' অবিধানে পারদের প্রতিশব্দ "হরবীজে"র উল্লেখ আছে। ইহা হইতে সম্প্রমাণিত হইতেছে যে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তান্ত্রিক গ্রন্থসকল এত সমধিক প্রচলিত হইয়াছিল সে পারদসম্বন্ধে তান্ত্রিক মত ("হরবীজ") অভিধান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (Metallurgy)—পারদের প্রধান খনিজ দ্রব্য—হিঙ্গুল বা দরদ। এই হিঙ্গুল হইতে আজ পর্য্যন্ত পারদ আহৃত হইয়া থাকে। কাশ্মীরের অন্তর্গত দরদিস্থান নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ হিঙ্গুলের আকরের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং দরদ শব্দও এই দরদিস্থান হইতে হইয়াছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে এই "দরদ দেশে" পারদের উদ্ভব বলিয়া লিখিত হইয়াছে—পারদ অগ্নিদেবের মুখ হইতে দরদ দেশে পড়িয়াছিল এবং সেই অবধি ঐ দেশের মৃত্তিকা মধ্যে উহা রহিয়া গিয়াছে। ঐ মৃত্তিকাকে পাতনযন্ত্রে উত্তপ্ত করিলে পারদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

* পতিতো দরদে দেশে গৌরবাদ্বহ্নিবক্ত্রতঃ।
স রসো ভূতলে লীনস্তদ্দেশনিবাসিনঃ।
তাং মৃদং পাতনযন্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা সূতং হরন্তি চ॥
রসরত্নসমুচ্চয় প্রথম অধ্যায় ৮৯, ৯০।

হিঙ্গুল হইতে অতি সহজে পারদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিঙ্গুলকে কোনও পাতনযন্ত্রে উত্তপ্ত করিলে পারদ বাহির হইয়া থাকে। তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহেও এই প্রক্রিয়াতেই পারদ আহৃত হইত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। *

পারদ শোধন—ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন, তির্য্যক্‌পাতন—অধুনা যেমন ব্যবসায়ীরা পারদের সহিত সীসক ও বঙ্গ মিশ্রিত করিয়া থাকে পূর্ব্বেও সেইরূপ করা হইত। রসেন্দ্রচিন্তামণিকার লিখিয়াছেন "ব্যবসায়ীরা বিক্রয়ার্থ পারদের সহিত সীসক ও বঙ্গ মিশ্রিত করে। ঊর্দ্ধ, অধঃ, এবং তির্য্যক এই ত্রিবিধ পাতন কর্ম্মদ্বারাই উক্ত দোষের সংশোধন হইতে পারে।" † এই তির্য্যকপাতন বিধি নাগার্জ্জুনের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া বৈদ্যকে লিখিত হয়। ‡ কিন্তু যখন বৈদিক কাল হইতে সুরার ব্যবহার ভারতে প্রচলিত আছে, তখন পাতনবিধি বৈদিককালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ পাতনবিধি রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থে বিশদভাবে লিখিত আছে।

পারদ মারণ—প্রধানতঃ পারদ গন্ধক সংযোগে মারিতে হয়। ঐ

---

* (ক) দরদং পাতনযন্ত্রে পাতিতঞ্চ জলাশয়ে।
সত্বং সূতসংকাশং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ রসরত্নাকর।

(খ) ঊর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাতিতম্‌।
হিঙ্গুলস্তস্য সূতস্তু শুদ্ধমেব ন শোধয়েৎ। ভাবপ্রকাশ।

† মিশ্রিতৌ চেদ্রসে নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা।
তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমোদোষঃ তন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ।
রাসেন্দ্রচিন্তামণি।

‡ তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ।
রসেন্দ্রচিন্তামণি,।
রসরত্নসমুচ্চয়,।

মারিত পারদকে কজ্জলী বলে। কজ্জলীকে ঊর্দ্ধপাতিত করিয়া স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর প্রস্তুত হয়। নিম্নলিখিত পারদের যৌগিক সকল বৈদ্যকে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল যৌগিক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে :—

(১) রসকর্পূর—Calomel.

(২) রসপুষ্পম্—Perchloride of mercury.

(৩) কজ্জলী—Black Sulphide of mercury.

(৪) স্বর্ণসিন্দূর, রসসিন্দূর, ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ, সিদ্ধ মকরধ্বজ—Resublimed mercuric sulphide.

বলা বাহুল্য অধঃপাতন ও ঊর্দ্ধপাতন (Sublimation) কঠিন (solid) পদার্থের উপর প্রযোজ্য, পারদের ন্যায় তরল পদার্থের উপর নহে। তির্য্যকপাতন (distilation) বা আধুনিক আকাশপাতনের (vacuum distilation) দ্বারাই পারদ অধিক পরিমাণে পাতিত হইতে পারে। আধুনিক বৈদ্যেরা অনেকে নিজেরা হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিয়া কজ্জলী, স্বর্ণসিন্দূর প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। তাহাতে হিঙ্গুলোত্থ পারদের মূল্য অনেক পড়ে—একসের হিঙ্গুলোত্থ পারদের মূল্য সাধারণতঃ ৪০, টাকা। ইউরোপ হইতে যে পারদ ভারতে আমদানি হয় তাহার মূল্য সাধারণতঃ চারি টাকা হইতে আট টাকা মাত্র। সেই পারদ নাইট্রিক অম্ল (nitric acid) বা আকাশ-পাতনের দ্বারা বিশোধিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ পারদের মূল্য অনেক কম হয় (১৩১৬ সালের "প্রবাসী"তে গ্রন্থকারের "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" প্রবন্ধাবলী দেখুন)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পারদ যৌগিক (Compounds of mercury)।

১। রসকর্পূর। (calomel)

রসকর্পূরের ইংরাজি নাম কেলমেল (calomel), বৈজ্ঞানিক নাম মার্‌কিউরস্ ক্লোরাইড্ (mercurous chloride)। ইউরোপে এই দ্রব্য ষোড়শ শতাব্দীতে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, * কিন্তু ভারতে তাহার বহুপূর্ব্বে রসেন্দ্রচিন্তামণিকার চুণ্ডুকনাথ এই রসকর্পূরকে "সর্ব্বরোগহর" বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। রসেন্দ্রসারসংগ্রহকার গোপালকৃষ্ণ এই রসকর্পূর বা সুধানিধিরসের গুণ বর্ণনকালে লিখিয়াছেন "ইহা দ্বারা উর্দ্ধরেচন হয়, সুতরাং দুই প্রহরান্তে পুনঃপুনঃ শীতল জল পান করিবে। ইহা এক বৎসর সেবন দ্বারা সর্ব্ববিধ বিষদোষ, ছয় মাস সেবন দ্বারা গরলবিষ এবং একমাস সেবন দ্বারা সিংহদংশনজনিত বিষ বিনষ্ট হয়।" † পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রসেন্দ্রচিন্তামণি এবং রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এই উভয় গ্রন্থই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত। শার্ঙ্গধরও তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থে এই রসকর্পূর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই— তিনি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থ লিখেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইউরোপে রসকর্পূরের ঔষধরূপে প্রচলনের প্রায় দুইশত

---

* "It appears to have been used in the sixteenth century as a medicine, known by the name of draco mitiatus, manua metallorum, aquila alba, or mercurius dulcis"—Roscoe and Schorlemer's Treatise on Chemistry, Vol. II, Mercurous salts.

† উর্দ্ধং রেচয়তি দ্বিযামমসকৃৎ পেয়ং জলং শীতলং।
এতদ্ধন্তি চ বৎসরাবধি বিষং ষাণ্মাসিকং মাসিকং।
শৈলোত্থং গরলং মৃগেন্দ্রকুটিলোদ্ভুতঞ্চ তৎকালিকং।

বৎসর পূর্ব্বে ভারতে উহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। বাস্তবিক রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত তাৎকালিক ইউরোপ হইতে অনেক বিষয়ে উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। এই রসকর্পূর প্রস্তুতপ্রণালী ও তাহার রাসায়নিক ব্যাখ্যা অধ্যাপক রায় মহাশয়ের হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে (পৃঃ ১৩৭—১৪৩) বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। এখানে এই বিষয়ের সামান্য আলোচনা করা হইবে।

প্রস্তুতপ্রণালী—রসেন্দ্রচিন্তামণি * নিম্নলিখিত উপায়ে রসকর্পূর প্রস্তুত করিয়াছেন। "একটি সুদৃঢ় স্থালীর চতুর্থাংশ লবণ দ্বারা পূর্ণ করিবে, তদুপরি পারদের চতুর্থাংশ সৈন্ধব এবং তদুপরি সৈন্ধবের সমান ফটকিরি প্রদান করিবে। ফটকিরি, সৈন্ধব, ও শোধিত পারদ, সমান পরিমাণে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া পর্প টি করিবে। সেই পর্প টি ভাণ্ডস্থ ফটকিরির উপর প্রদানপূর্ব্বক তাহার উপর পুনর্ব্বার ফটকিরি ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রদান করিয়া তাহার উপর কতকগুলি খাপরা দিয়া তদুপরি একটি দৃঢ় স্থালী আচ্ছাদন করিয়া রুদ্ধ করিবে। পরে তিন দিবস অগ্নিতে পাক করিবে।"

ভাবপ্রকাশ † শোধিত পারদ, গিরিমাটি, ইষ্টক, খড়ি, ফটকিরি, সৈন্ধব লবণ, উইয়ের মাটি, ক্ষার লবণ, ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা, প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চারি দিবস জ্বাল দিয়া উর্দ্ধপাতনের দ্বারা রসকর্পূর প্রস্তুত করিয়াছেন। উপরোক্ত দুইটি উপায়ে রসকর্পূর প্রস্তুত কালে যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পারদ, ফট্‌কিরি এবং লবণ এই তিনটি দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া রসকর্পূর প্রস্তুত হয়। ফট্‌কিরি (alum) উত্তপ্ত হইলে

---

* রসেন্দ্রচিন্তামণি (উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্নের সংস্করণ)—পৃঃ ৮।

† ভাবপ্রকাশ—পৃঃ ৬৪০।

সাল্‌ফিউরিক অম্ল (sulphuric acid) উৎপন্ন হয়। এই অম্ল খানিকটা পারদের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাল্‌ফেট অব মার্কারি (sulphate of mercury) এবং খানিকটা লবণের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অম্ল (hydrochloric acid) উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহার পর উৎপন্ন সালফেট অব মার্কারি এবং হাইড্রোক্লোরিক অম্লের রাসায়নিক সংযোগে রসকর্পূর (mercurous chloride) প্রস্তুত হয়। পারদ, ফট্‌কিরি ও লবণ এই তিন দ্রব্যের সংযোগেই রসকর্পূর প্রস্তুত হয়, বাকি দ্রব্য-গুলির বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কেবল ভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত গৈরিক ও ইষ্টকচূর্ণের অন্যতম উপাদান ফেরিক অক্‌সাইড্ এক প্রকার হায়ক দ্রব্য (catalytic agent) এর কাজ করে। এইরূপে প্রস্তুত রসকর্পূর বিশুদ্ধ কেলমেল হইবে না, কেলমেল ও পার্‌ক্লোরাইড অব মার্কারির (perchloride of mercury) একটি মিশ্রণ (mixture) হইবে। এই শেষোক্ত দ্রব্যটি অত্যন্ত বিষাক্ত, সেই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে অবিশুদ্ধ কেলমেল খাইয়া অনেক রোগীর মুখে শোথ, ক্ষত প্রভৃতি হইয়াছে, এমন কি সময় সময় রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য কেলমেল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উষ্ণ জলে উহাকে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া লইতে হইবে, কারণ ঐ প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবণীয় (soluble) পারক্লোরাইড অব মার্কারি জলে দ্রব হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে তিন বা চারি দিবস অগ্নিজ্বাল দিবার ব্যবস্থা আছে। উহা কেবল অতিশয়োক্তি মাত্র, তিন চারি ঘণ্টাই যথেষ্ট।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ।—ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় তাঁহার Materia Medica of the Hindus নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বাজারের রসকর্পূর কেলমেল ও পারক্লোরাইডের মিশ্রিত পদার্থ। ডাক্তার ওসাউনেসী (O'Shaughnessy) তাঁহার Manual of

Chemistryতে (২৮০ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে তিনি রসকর্পূর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রায় সকল নমুনাগুলিই কেলমেল, একটি নমুনায় বিশুদ্ধ পারক্লোরাইড পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক রায় মহাশয় বাজার হইতে পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সকলগুলিই কেলমেল, তাহাতে পারক্লোরাইড আদৌ নাই। আমরা এইরূপ বিভিন্ন লেখকের মতের অনৈক্য দেখিয়া বাজার হইতে রসকর্পূর ক্রয় না করিয়া কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতায় অনেকগুলি বড় বড় কবিরাজী দোকান অনুসন্ধান করিয়া উহা ক্রয় করিতে পারি নাই। সকলেই বলেন যে তাঁহারা রসকর্পূর রাখেন না, বাজারে বেণের দোকানে পাইবেন। কেহ কেহ বলিলেন যে তাঁহারা রসকর্পূরের মত বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করেন না। অগত্যা বেণের দোকান হইতে রসকর্পূর ক্রয় করিতে হইল। দেখিতে চেপ্‌টান, ছোট ছোট দানাদার, ঈষৎ ময়লা রংযুক্ত পদার্থ। গুঁড়া করিয়া পরীক্ষায় জানা গেল যে তাহাতে পারক্লোরাইড্ আদৌ নাই। বেণেকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে সে বড়বাজারে পাইকারের নিকট কিনিয়াছে, এদেশ-জাত কি বিদেশ-জাত ঠিক বলিতে পারিল না। আরও কয়েক জায়গার রসকর্পূরে পারক্লোরাইড পাই নাই। সে যাহা হউক কেলমেল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহা গরম জলে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া লইলে পারক্লোরাইডের কোন ভয় থাকিবে না।

২। রসপুষ্পম্ ও সবিরম্।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে আজকাল কবিরাজ মহাশয়েরা শাস্ত্রানুযায়ী রসকর্পূর প্রস্তুত করেন না। তাঁহারা কজ্জলী (পারদ ও গন্ধক) এবং লবণ একত্রে মিশাইয়া উর্দ্ধপাতনের দ্বারা রসকর্পূর

প্রস্তুত করেন। অধ্যাপক রায় মহাশয়* বলিয়াছেন যে তিনি ঐ দুই দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ উপায়ে রসকর্পূর প্রস্তুত হইতে পারে না, ঊর্দ্ধপাতন কালে রসসিন্দূর ঊর্দ্ধপাতিত হয় এবং লবণ নিম্নে পড়িয়া থাকে। কিন্তু ডাক্তার এন্‌স্‌লি (Sir Whitlow Ainslie) তাঁহার মিটিরিয়া মেডিকা নামক গ্রন্থে মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত "রসপুষ্প" নামক ঔষধ প্রস্তুতের যে উপায় লিখিয়াছেন তাহাতে কজ্জলী, লবণ এবং ইষ্টকখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। † একটি পাত্রে ১২ ভাগ গন্ধক গলাইয়া ৮০ ভাগ পারদের সহিত কজ্জলী করিবে, আর একটি পাত্রের অর্দ্ধেক ছোট ছোট ইষ্টকখণ্ডে পূর্ণ করিয়া তাহার উপর লবণ দিবে। দুইটি পাত্র একত্র করিয়া মুখবন্ধ করিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা জ্বাল দিলে রসপুষ্প বা রসকর্পূর ঊর্দ্ধপাতিত হইবে। এখানে বোধ হয় ইষ্টকখণ্ডের অন্যতম উপাদান ফেরিক অক্‌সাইড সহায়ক দ্রব্যের (catalytic agent) কার্য্য করিয়া রসকর্পূর প্রস্তুত করিতেছে। এইরূপ উপায়ে প্রস্তুত "রসপুষ্প" কেলমেল ও পার্‌ক্লোরাইডের মিশ্রণ বলিয়া তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। এখানে গন্ধক ও পারদের যে ভাগ লওয়া হইয়াছে তাহা আধুনিক atomic theoryর অনুযায়ী (৩২ ; ২০০)।

ডাক্তার এন্‌স্‌লি "রসপুষ্প" ভিন্ন আরও একটি ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম "সবিরম্" (?) (সৌবীরম্)। ‡ এই ঔষধ তামিল-বৈদ্যগণ অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করেন এবং ইহার প্রস্তুতপ্রণালী "পুরাণশাস্ত্রে" (?) লিখিত আছে। এই প্রস্তুতপ্রণালী হইতে বুঝা যায় যে বিশুদ্ধ পার্‌ক্লোরাইড অব মার্কারি প্রস্তুত করিবার উপায় ভারতবাসী

---

* Ray ; History of Hindu Chemistry, Vol. 1, p. 143 and 144.

† O' Shaughnessy's Manual of Chemistry, p. 288.

‡ Ibid. p. 289.

অবগত ছিলেন। বঙ্গদেশ অঞ্চলে পারদের গন্ধকঘটিত যৌগিক (sulphide of mercury) এবং রসকর্পূর এই দুইটি পারদঘটিত যৌগিকই প্রচলিত আছে কিন্তু মাদ্রাজ অঞ্চলে পারক্লোরাইডের যে প্রচলন ছিল তাহা ডাক্তার 'এন্‌স্‌লির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে তামিল বৈদ্যগণ পার্‌ক্লোরাইড প্রস্তুত করিয়া থাকেন। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে রসপুষ্প প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে সেই রসপুষ্প ৮০ ভাগ, সমপরিমাণ লবণ, ৪০ ভাগ তুঁতে, ২০ ভাগ ফট্‌কিরি, ২০ ভাগ সোরা, ২০ ভাগ পুণীর (ক্ষারাত্মক মৃত্তিকা), ১০ ভাগ হীরাকস এবং ৫ ভাগ নবসার (নিশাদল)—এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক একটী বোতলের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করিয়া ৩৬ ঘণ্টা জ্বাল দিতে হইবে। অবশ্য বোতলের গাত্রে কাদা লেপিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর বোতল ভাঙ্গিয়া গলদেশে সংলগ্ন পার্‌ক্লোরাইড্‌ গ্রহণ করিতে হইবে।* এই উপায়ে রসপুষ্পের অন্যতম উপাদান কেলমেলকে (mercurous chloride) পার্‌ক্লোরাইডে (mercuric chloride) পরিণত করা হইয়াছে। প্রথমে তুঁতে, ফট্‌কিরি এবং হীরাকস হইতে সাল্‌ফিউরিক অম্ল উৎপন্ন হয়, সেই অম্ল সোরার সহিত সংযুক্ত হইয়া নাইট্রিক অম্ল (nitric acid) উৎপন্ন করে। খানিকটা সাল্‌ফিউরিক অম্ল লবণ ও নিশাদলের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অম্ল (hydorchloric acid) উৎপন্ন করে। এই দুই উৎপন্ন অম্ল সংযোগে ক্লোরিন (chlorine) নামক গ্যাস উৎপন্ন হইয়া কেলমেলকে পরক্লোরাইডে পরিণত করে। হলাণ্ড (Holland) দেশে আজ পর্য্যন্ত এই উপায়ে পার্‌ক্লোরাইড প্রস্তুত হইয়া থাকে।

---

* O' Shaughnessy's Manual of Chemistry, p. 289-290.

৩। কজ্জলী (black sulphide of mercury)

প্রাচীন ইতিহাস—"পারদ" দেখুন। নাগার্জ্জুনকৃত রসরত্নাকরে সমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক পেষণ করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। বৃন্দ একভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক এবং চক্রপাণি সমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী তান্ত্রিকযুগে প্রায় শতকরা নব্বইটি ধাতুঘটিত ঔষধে কজ্জলী ব্যবহৃত হইয়াছে। রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পারদের ছয়গুণ গন্ধক দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রস্তুতপ্রণালী—সাধারণতঃ পারদের দ্বিগুণ গন্ধক লইয়া একত্রে পারদ ও গন্ধক লৌহদণ্ডের দ্বারা ক্রমাগতঃ মর্দ্দন করা হয়। মর্দ্দন করিতে করিতে ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপ ঘর্ষণ প্রক্রিয়াতে পারদ ও গন্ধক মিলিত হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া থাকে এবং সমগ্র পারদকে গন্ধকের সহিত মিলিত করিবার জন্য অনেক বেশী গন্ধকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আধুনিক রসায়ন সপ্রমাণ করিয়াছে যে পারদের ওজনের এক ষষ্ঠমাংশ মাত্র ওজনের গন্ধকের সহিত পারদ মিলিত হইয়া থাকে। সেই স্থলে বৈদ্যকে ঘর্ষণদ্বারা কজ্জলী প্রস্তুত করিবার সময় পারদের সমগুণ, দ্বিগুণ, তিনগুণ এমন কি ছয়গুণ ওজনের গন্ধক ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ ঘর্ষণের দ্বারা কজ্জলী প্রস্তুতকালে একখানি আতসী কাঁচের (magnifying glass) দ্বারা দেখিয়া লওয়া উচিত যে অসংযুক্ত পারদ উহাতে আছে কি না।

স্বর্ণসিন্দুর বা রসসিন্দুর প্রস্তুত কালেও এইরূপ ঘর্ষণের দ্বারা কজ্জলী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বহু সময়সাপেক্ষ এবং ইহাতে গন্ধকের বহুলপরিমাণে অপচয় ঘটিয়া থাকে। তাহার পরিবর্ত্তে গন্ধক অগ্রে

মৃদু অগ্নিতে গলাইয়া ক্রমশঃ পারদ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া নাড়িতে হইবে, পরে উহাকে নামাইয়া গুঁড়া করিয়া পুনরায় মৃদু অগ্নিতে গলাইতে হইবে। এইরূপে দুই তিন বার নামাইবার পর গুঁড়া করিয়া লইলে পনের মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কজ্জলী প্রস্তুত হইবে এবং পারদের ওজনের অর্দ্ধেক, উর্দ্ধসংখ্যা সমান পরিমাণ গন্ধক লাগিবে। বৈদ্যকেও স্থানে স্থানে গন্ধক গলাইয়া কজ্জলী প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে।*

ষড়্‌গুণবলিজারণ—রসগ্রন্থাবলী পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে এই ধারণা ছিল যে গন্ধক যত বেশী দেওয়া যায় পারদের গুণও তত বর্দ্ধিত হয়। এমন কি রসেন্দ্রচিন্তামণিকার লিখিয়াছেন যে "ষড়্‌গুণবলিজারণং বিনায়ং ন খলু রুজাহরণক্ষমো রসেন্দ্রঃ" অর্থাৎ পারদ ষড়্‌গুণ গন্ধকের দ্বারা জারিত না হইলে কখনই রোগ হরণে সমর্থ হয় না। সেই জন্য রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পারদের ছয়গুণ ওজনের গন্ধকের সহিত মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। এই ষড়্‌গুণবলিজারণ দুইপ্রকারে সিদ্ধ হইত। প্রথম—পারদ ও ছয়গুণ গন্ধক একত্র ঘর্ষণ করিয়া কজ্জলীর ন্যায় প্রস্তুত হইত। দ্বিতীয়—বালুকাযন্ত্রে একটি তৈলভাণ্ডে পারদের সমান গন্ধক প্রথম দিবার পর উহা গলিয়া তৈলবৎ হইলে তাহাতে ঐ পারদ প্রদান করিতে হইবে। আবার পারদ অর্দ্ধ জাগিয়া উঠিলে পুনর্ব্বার পারদ ঐ ভাণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ষড়্‌গুণ গন্ধক অল্পে অল্পে নিক্ষেপ করিয়া জীর্ণ হইলে যে পারদ প্রস্তুত

* প্রক্ষেপ্য গন্ধকং তত্র জ্বালাং মৃদ্বগ্নিনা দহেৎ।
গন্ধকে স্নেহমাপন্নে তৎসমং পারদং ক্ষিপেৎ॥
মিশ্রকৃত্য ততো দ্বাভ্যাং দ্রুতং তমবতারয়েৎ।
আমর্দ্দয়েৎ তথা তত্তু যথাস্যাৎ কজ্জলপ্রভম্॥
ভৈষজ্যরত্নাবলী।

হইবে তাহা অতীব বীর্য্যবান্ হইবে। * বলা বাহুল্য এই ষড়্গুণবলীজারণ নিতান্তই নিরর্থক, কারণ পারদ উহার ওজনের ষষ্ঠমাংশ মাত্র (ষড়্গুণ নহে) গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার বেশী যাহা গন্ধক ব্যবহৃত হইবে তাহা সমস্তই অসংযুক্ত ভাবে থাকিবে।

৪। রসপর্প্পটি।

প্রাচীন ইতিহাস—রসরত্নাকরের মতে নাগার্জ্জুন রসপর্প্পটির আবিষ্কর্ত্তা। চক্রপাণি লিখিয়াছেন "এসা রসপর্প্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা"। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চক্রপাণিকে আমরা বৈদ্যকশাস্ত্রে রসপর্প্পটির প্রবর্ত্তয়িতা বলিতে পারি (পারদ দেখুন)।

প্রস্তুতপ্রক্রিয়া—কজ্জলী ও রসপর্প্পটির প্রস্তুত প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ এই যে পর্প্পটি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া উহাকে অল্প গলাইয়া লইতে হয়। চক্রপাণি নিম্নলিখিত উপায়ে পর্প্পটি প্রস্তুত করিয়াছেন—"সমপরিমাণ শোধিত পারদ ও গন্ধক মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর কুলকাঠের আগুনের উপরে একটি লৌহপাত্রে উহাকে দ্রবীভূত করিয়া লইবে। তৎপরে গোময়োপরি কদলীপত্র স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি সেই দ্রবকজ্জলী ঢালিয়া সেই গোময়-পূরিত কদলীপত্রের পুটলীর দ্বারা চাপিয়া ধরিবে। এইরূপে রসপর্প্পটি প্রস্তুত হইবে।" †

---

* সূতপ্রমাণং সিকতাখ্যযন্ত্রে দত্ত্বা বলিং মৃদ্ঘটিত তৈলভাণ্ডে। তৈলাবশেষেঽত্র রসং নিদধ্যাৎ মগ্নার্দ্ধকায়ং প্রবিলোক্য ভূয়ঃ। ষড়্গুণং গন্ধকমল্পমল্পং ক্ষিপেদসৌ জীর্ণবলির্ব্বলী স্যাৎ—রসেন্দ্রচিন্তামণি।

† শুদ্ধৌ সমানৌ রসগন্ধকৌ॥
সম্মর্দ্দ্য কজ্জলাভস্তু কুর্য্যাৎ পাত্রে দৃঢ়াশ্রয়ে।
ততো বাদরবহ্নিস্থলৌহপাত্রে দ্রবীকৃতম্॥
গোময়োপরি বিন্যস্ত কদলীপত্রপাতনাৎ।
কুর্য্যাৎ পর্পটিকাকারমস্য রক্তিদ্বয়ং ক্রমাৎ॥ চক্রদত্তসংগ্রহ—রসপর্প্পটিকা।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—কজ্জলী দেখিতে মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া এবং পর্পটি কৃষ্ণবর্ণ চেপ্টা চেপ্টা খণ্ডাকৃতি। পর্প টিকে গুঁড়াইলে কজ্জলীর মত দেখিতে হয়। উভয়ই কৃষ্ণ সালফাইড অব মার্কারি (black sulphide of mercury) এবং অসংযুক্ত গন্ধকের মিশ্রণ। অধ্যাপক রায় মহাশয় একটি পর্প টি পরীক্ষা করিয়া শতকরা ৪৪ ভাগ অসংযুক্ত গন্ধক পাইয়াছিলেন।

৫। রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর (মকরধ্বজ) ও সিদ্ধমকরধ্বজ।

(Resublimed mercuric sulphide)

প্রস্তুতপ্রণালী—আধুনিক বৈদ্যগণ রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর, বা স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ও সিদ্ধ মকরধ্বজ নামে তিনটী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণের অভাবে এই তিনটি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই তিনটি পদার্থ আদৌ ভিন্ন নহে। এই বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথম উহাদের প্রস্তুত প্রণালীর আলোচনা আবশ্যক।

(ক) রসসিন্দূর।—তান্ত্রিক গ্রন্থ সমূহে রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। পরে একটি কাঁচের বোতলকে মৃত্তিকা সংযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিরা উহার ভিতর কজ্জলী গ্রহণপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে এক বা ততোধিক দিবস পাক করিতে হইবে। তৎপর বোতলের গললগ্ন "তরুণাদিত্যসন্নিভ" লোহিত বর্ণের পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই রসসিন্দূর। এই প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় কজ্জলী উত্তাপ সংযোগে উর্দ্ধপাতিত (sublimed) হইয়া বোতলের গলদেশে লোহিতাকারে লগ্ন হয়। এই লোহিত দানাদার পদার্থ উর্দ্ধপাতিত মার্কিউরিক সলফাইড।

(খ) স্বর্ণ-সিন্দুর—স্বর্ণ-সিন্দুর ও রসসিন্দুরের প্রস্তুতপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য এই যে স্বর্ণসিন্দুরের জন্য কজ্জলী প্রস্তুত কালে পারদ ও গন্ধকের সহিত স্বর্ণপত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১ ভাগ মৃদু স্বর্ণপত্র, ৮ ভাগ পারদ ও ১৬ ভাগ গন্ধক একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরে রসসিন্দুর প্রস্তুতপ্রণালী অনুযায়ী এই কজ্জলী বোতলের মধ্যে গ্রহণপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে এক বা ততোধিক দিবস পাক করিতে হয়। শীতল হইলে উর্দ্ধপাতিত বোতলের গলদেশলগ্ন লোহিত বর্ণের পদার্থ গ্রহণ করা হয়। ইহাই স্বর্ণসিন্দুর। এই প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ নিতান্ত নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই স্বর্ণমিশ্রিত কজ্জলীকে উর্দ্ধপাতিত করা হয়, তখন কেবল মাত্র মার্কিউরিক সলফাইডই উর্দ্ধপাতিত হইয়া থাকে, স্বণ আদৌ উর্দ্ধপাতিত হয় না, সমস্তই বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকে। স্বর্ণ-সিন্দুর প্রস্তুতকালে কজ্জলীর সহিত স্বর্ণপত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া স্বর্ণসিন্দুর "স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক স্বর্ণসিন্দুর স্বর্ণসংযুক্ত আদৌ নহে। এই স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতকালে স্বর্ণ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। আধুনিক বৈদ্যেরা বোতলের নিম্নস্থিত সূক্ষ্ম স্বর্ণ স্বর্ণভস্মরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কেহ কেহ উহা হইতে স্বর্ণ আহরণপূর্ব্বক অন্যকার্য্যেও ব্যবহার করিয়া থাকেন।*

* "স্বর্ণঘটিত" স্বর্ণসিন্দুরপ্রস্তুতকালে স্বর্ণ ব্যবহৃত হয় বলিয়া আধুনিক বৈদ্যেরা উহা অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং দেশের অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতকালে স্বর্ণ ব্যবহৃত না হইলে উহাতে কোনও গুণ থাকে না। একভরি রসসিন্দুর সাধারণতঃ চারি টাকা ও একভরি স্বর্ণসিন্দুর চব্বিশ টাকায় বিক্রীত হয়, কিন্তু ইউরোপজাত বিশুদ্ধ উর্দ্ধপাতিত মার্কিউরিক সলফাইড, এক ভরির মূল্য পাঁচ পয়সা বা ছয় পয়সা মাত্র। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হইলে রসসিন্দুর বা স্বর্ণসিন্দুর (দুইই একই পদার্থ) আমাদের দেশেও একভরি চারি আনা বা আট আনা মূল্যে

(গ) সিদ্ধ মকরধ্বজ—প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহে এই সিদ্ধ মকরধ্বজের কোথাও উল্লেখ দেখিলাম না; অথচ প্রায় প্রত্যেক কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ-তালিকায় উহা স্থান পাইয়াছে। একজন কবিরাজ মহাশয়ের তালিকাপুস্তক হইতে জানা যায় যে, এই মকরধ্বজও স্বর্ণঘটিত এবং এই মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে সাধারণ পারদ ব্যবহার না করিয়া শত বা সহস্রপুটিত পারদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার জন্য শত বা সহস্রপুটিত পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ মিলাইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করা হয় ও পরে উর্দ্ধপাতনের দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অপর একজন কবিরাজের তালিকাপুস্তক হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, শত বা সহস্রবার পুনঃপুনঃ গন্ধক দিয়া পুনঃপুনঃ উর্দ্ধপাতিত করিয়া এই মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।* (১)

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে শত বা সহস্রবার পুটিত বা মারিত পারদ কি, তাহাই বিবেচ্য। পারদকে গন্ধকের দ্বারাই মারিত ও পুটিত করা হয়—"দুই ভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন নিরন্তর মর্দ্দনপূর্ব্বক মুখ বন্ধ করত ভূধরযন্ত্রে একদিন পুটপাক করিয়া লইলে পারদ মারিত হয়।" † (২) এইরূপে পুটিত বা মারিত পারদ অবিশুদ্ধ কালো মারকিউরিক সল্‌ফাইডই (impure black mercuric sulphide) হইবে। এইরূপে বার বার গন্ধক দিয়া পারদ পুটিত হইলেও তাহা মারকিউরিক সল্‌ফাইড (resublimed mercuric sulphide) বা রসসিন্দুরেই পরিণত হইবে

বিক্রিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না।

* এই মকরধ্বজের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—ইহার মূল্য এক ভরি ৮০৲ টাকা।

†"দ্বিপলং শুদ্ধসূতস্য সূতার্দ্ধং গন্ধকং তথা। কন্যা নীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং নিরন্তরং। রুদ্ধা তদ্ভূধরে যন্ত্রে দিনমেকং মারয়েৎ পুটে।" রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

—ভিন্ন দ্রব্য হইবে না। অবশ্য স্বর্ণ এস্থলেও বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকিবে এবং সেই কারণে উহা নিতান্ত নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ইতিহাস—(১) ষড়্গুণবলিজারণ—এই সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে প্রচলিত তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে পারদের সহিত কয়গুণ গন্ধক দিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ছয়গুণ গন্ধক দিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্ভবতঃ অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সহিত পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থসমূহে ছয়গুণ ক্রমশঃ দ্বিগুণ, সমগুণ এমন কি অর্দ্ধেক পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নাগার্জ্জুন, বৃন্দ ও চক্রপাণি পারদের সমপরিমাণ গন্ধক মিলাইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্ন-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে ছয়গুণ গন্ধক দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তবে রসেন্দ্র-চিন্তামণিতে "চন্দ্রোদয়রস" প্রস্তুতকালে যে "স্বর্ণসিন্দুর" প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে দুইগুণ গন্ধক দেওয়া হইয়াছে। রসেন্দ্রসার-সংগ্রহে "ষড়্গুণবলিজারণ" কোথাও দেখিতে পাইলাম না। ঐ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পারদের সমান, দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ গন্ধক ব্যবহারের উল্লেখ আছে, কোথাও "ষড়্গুণ" গন্ধক ব্যবহৃত হয় নাই। গন্ধক অধিক দিলে যে উহাও মকরধ্বজের সহিত ঊর্দ্ধপাতিত হইয়া বোতলের গলদেশে লগ্ন হইয়া থাকে তাহা রাসেন্দ্রসারসংগ্রহ-কার জানিতেন। তিনি বলিয়াছেন "স্ফোটয়িত্বা মক্তাভমূর্দ্ধলগ্নং বহিঃ ত্যজেৎ। অধঃস্থং রসসিন্দুরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।" শাঙ্গর্ধর পারদের সমান পরিমাণ গন্ধক লইয়াছেন। ভাবপ্রকাশে কোথাও পারদের "ষড়্গুণবলিজারণ" দেখিলাম না। ভাবপ্রকাশ "সিন্দূররস" প্রস্তুত-

কালে "পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকং" অর্থাৎ পারদের অর্দ্ধেক শোধিত গন্ধক লইতে উপদেশ দিয়াছেন।

(২) স্বর্ণ ব্যবহার—স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতকল্পে স্বর্ণব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থসমূহে স্বর্ণ-ব্যবহার যেন পরিত্যক্ত হইয়াছে। রসরত্নাকর, রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্র-চিন্তামণি প্রভৃতি প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহ স্বর্ণ-ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু রসেন্দ্রসার-সংগ্রহকার "রসসিন্দুর"ই প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহা "অনুপানবিশেষণ করোতি বিবিধান গুণান" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পৃথক করিয়া "স্বর্ণসিন্দুর" প্রস্তুত করেন নাই। ঐ গ্রন্থে "চন্দ্রোদয় রস বা মকরধ্বজ" প্রস্তুত কালে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐরূপে প্রস্তুত মকরধ্বজের সহিত কস্তুরী প্রভৃতি বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ মিশ্রিত থাকাতে বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের কি গুণ তাহা জানা যায় না। শার্ঙ্গধর পারদভস্ম প্রস্তুত কালে সমান পরিমাণ গন্ধক দিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি কোথাও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দেন নাই। ভাবপ্রকাশে স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। ভাবমিশ্র কেবল সিন্দুররস বা রসসিন্দুর প্রস্তুতের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং ঐ ঔষধের অনেক গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। "রসপ্রদীপ" স্পষ্টতঃ মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে স্বর্ণ বাদ দিতে উপদেশ দিয়াছেন।*

* Ray :—History of Hindu Chemistry, Vol I, p. 13, footnote—"a later work Rasapradipa is sceptical about the part which gold plays and recommends its being left out."

১৩১৬ ও ১৩১৭ সালের "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত মদীয় "আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি দেখুন। অধ্যাপক রায়ের "নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি", "History of Hindu Chemistry, Part II" ও দ্রষ্টব্য। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে অধ্যাপক রায় প্রমুখ বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের দ্বারা পরিচালিত

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর ও সিদ্ধমকরধ্বজ দেখিতে সম্পূর্ণরূপে একই প্রকার। চক্‌চকে, ঈষৎলোহিত, দানাদার পদার্থ। প্রত্যেকটিকে গুঁড়াইলে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের সিন্দূর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রসসিন্দূর (Resublimed mercuric sulphide) :—

গন্ধক ... ... শতকরা ১৩. ৭৯ ভাগ

স্বর্ণসিন্দূর *

স্বর্ণ ... ... নাই

গন্ধক ... ... ১৩. ৮৯ ভাগ

সিদ্ধমকরধ্বজ †

স্বর্ণ ... ... নাই

অসংযুক্ত গন্ধক ... ... নাই

গন্ধক ... ... ১৩. ৪৫ (প্রথম পরীক্ষা)

১৩. ৬২ (দ্বিতীয় পরীক্ষা)

"বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্" নামক রাসায়নিক কারখানায় এখনও পর্য্যন্ত এই "স্বর্ণঘটিত" স্বর্ণসিন্দূর চব্বিশ টাকা করিয়া ভরি বিক্রয় হইতেছে। সত্যের মান রক্ষা করিবার জন্য, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে আমরা বেঙ্গল কেমিকেলের পরিচালকবর্গকে কি অনুরোধ করিতে পারি না ?

যদি স্বর্ণসিন্দুরে স্বর্ণের গুণ বর্ত্তাইতে হয় তাহা হইলে উর্দ্ধপাতিত রসসিন্দুর গ্রহণ করিয়া উহার সহিত স্বর্ণভস্ম মিশাইতে হইবে। উর্দ্ধপাতিত করিবার পূর্ব্বে স্বর্ণব্যবহার নিতান্তই নিরর্থক। ১৩১৬ ও ১৩১৭ সালে "প্রবাসী" পত্রিকায় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই বিষয় আলোচিত হইলে কয়েক ব্যক্তি "স্বর্ণসংযুক্ত" মকরধ্বজের নমুনা গ্রন্থকারের নিকট রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল নমুনায় স্বর্ণ ছিল। তাঁহারা স্বর্ণসিন্দুরের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে স্বর্ণভস্ম মিশাইয়াছিলেন। সংবাদপত্রেও এখন কেহ কেহ এইরূপ "স্বর্ণসংযুক্ত" মকরধ্বজের (Makaradwaj with gold) বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

* Ray : History of Hindu Chemistry, Vol. II.

† গ্রন্থকার—প্রবাসী, ১৩১৭ সাল, চৈত্র, ৬৮৩ পৃঃ।

এই তিনটি দ্রব্যই উর্দ্ধপাতিত করিয়া প্রস্তুত হওয়ার জন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ। সেইজন্য উহাদের রাসায়নিক পরীক্ষার ফল হইতে জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে উহারা একেবারে অভিন্ন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

লৌহ (Iron)।

প্রাচীন ইতিহাস—বৈদিকযুগে যে ভারতে লৌহের প্রচলন ছিল তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ("ধাতুবর্গ—বৈদিক যুগ" দেখুন)। বাস্তবিক আধুনিক কালে ইংলণ্ড ও আমেরিকা লৌহের জন্য যেমন বিখ্যাত, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষও সেইরূপ লৌহের জন্য বিখ্যাত ছিল। লৌহ মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তথাপি ভারতের নানাস্থানে প্রাচীনযুগের লৌহশিল্পের নমুনা এত অধিক পাওয়া যায় যে তাহাতে মনে হয় ভারত লৌহশিল্পে প্রায় অদ্বিতীয় ছিল। * সার জন হক্‌স সত্যই বলিয়াছেন "the supply of iron in India, as early as the fourth and fifth centuries, seems to have been unlimited. In the temples of Orissa iron was used in large masses, as beams or girders in roof work in the 13th century, and India well repaid any advantages which she may have derived from the early civilised communities of the west

---

* আধুনিক কালে ভারতের লৌহশিল্পের আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতেছে। গত ১৯১২ সালের পূজার বন্ধে সুবিখ্যাত টাটা কোম্পানীর যে সুবৃহৎ লৌহের কারখানা সাক্‌চিতে দেখিয়া আসিয়াছি তাহার তুল্য সুবৃহৎ কারখানা এসিয়াতে নাই। ইতিমধ্যেই এই কারখানার লৌহ বহুল পরিমাণে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া এমন কি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত রপ্তানি হইতেছে।

if she were the first to supply them with iron and steel" ।*
সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক রস্‌কো ও সার্ল্লেমার দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভের উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "The dexterity exhibited by the Hindus in the manufacture of wrought iron may be estimated from the fact of the existence in the Mosque of the Kutub near Delhi of a wrought iron pillar no less than 60 feet in length. This pillar stands about 30 feet out of ground, and has an ornamental cap bearing an inscription in Sanskrit belonging to the fourth century. It is not an easy operation at the present day to forge such a mass with our largest rolls and steam hammers; how this could be effected by the rude hand-labour of the Hindus we are at a loss to understand."†

এক্ষণে প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্পের কয়েকটি নমুনার বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

---

* Sir John Hawkshaw's opening address, British Association Meeting, Bristol, 1815.

† বাস্তবিক দিল্লীর স্তম্ভ ৬০ ফুট লম্বা নহে, উহা ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা। "It is a curious illustration how difficult it sometimes is to obtain correct information in India, that when General Cunningham published his "reports" in 1871, he stated apparently on the authority of Mr. Cooper, Deputy Commissioner, that excavation had been carried down to a depth of 26 ft. but without reaching the bottom.

(১) বুদ্ধগয়ার মন্দিরের লৌহ।

বুদ্ধগয়ার সুপ্রসিদ্ধ মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপের নিম্নপ্রদেশ খনন করিয়া লৌহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যেমন আজকাল কোন সরকারী গৃহাদির প্রতিষ্ঠাকালে ভূগর্ভে খবরের কাগজ, প্রচলিত মুদ্রা, সুবর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি প্রথমে প্রোথিত করা হয়, সেইরূপ প্রাচীন ভারতে স্তূপ স্থাপনকালে নানাবিধ মুদ্রা, লৌহ, স্বর্ণ, মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ন প্রোথিত করা হইত। বুদ্ধগয়ার স্তূপ অতি প্রাচীন, উহার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ চীন-পর্য্যটক হুয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা অশোক (খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬৩—২২৬) সর্ব্ব প্রথমে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অনেক পরে এই বিহারটি মন্দিরে পরিণত হয়। জেনারাল ক্যানিংহামের মতে রাজা হুবিস্কের সময়ে উহা নির্ম্মিত হয়, এবং চতুর্থ খৃষ্টাব্দে উহার বিস্তৃতি সাধিত হয়। কিন্তু ফার্গুসান সাহেব উহা খৃষ্টপরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের আশোকের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি খনন করিয়া একখণ্ড লৌহমল (iron slag) পাওয়া গিয়াছে। উহা কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এই লৌহমল আজ পর্য্যন্ত ভারতে আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক লৌহের নমুনার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

The man in charge, however, assured him that the actual depth reached was 35 ft. (vol. I. p. 169). He consequently estimated the whole length at 60 ft. but fortunately ordered a new excavation, determined to reach the bottom and found it at 20 inches below the surface (vol. IV. p. 28.)—Fergusson's "History of Indian & Eastern Architecture."

বুদ্ধগয়ার মন্দির হইতে অনেকগুলি লৌহকীলক (iron clamps) আহৃত হইয়া কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। উহারা প্রায় এক বিঘত লম্বা এবং দেখিতে খুব মরিচা ধরা।

(১) প্রধান মন্দিরের একটী দরজার পাশ হইতে কয়েকটী কীলক পাওয়া গিয়াছে।

(২) মন্দিরের চারিপার্শ্বস্থ স্তূপ হইতে অনেকগুলি লৌহকীলক পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপ লৌহকীলক পুরী, কানারক প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে প্রস্তরাদি আটকাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বুদ্ধগয়ার মন্দিরের প্রাচীনত্ব হেতু ঐতিহাসিক হিসাবে এই সকল লৌহকীলকের মূল্য খুব বেশী।

(২) দিল্লীর লৌহস্তম্ভ।

এই বিশ্ববিখ্যাত গোলাকার লৌহস্তম্ভ দিল্লীসহর হইতে প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ কুতব মিনারের সন্নিকটে দণ্ডায়মান। মৃত্তিকার উপরে ইহার উচ্চতা ২২ ফুট, এবং উহার ১ ফুট ৮ ইঞ্চি মৃত্তিকাতে প্রোথিত, সর্ব্বসমেত স্তম্ভটি ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা। নিম্নদিকে ইহার ব্যাস ১৬.৪ ইঞ্চি এবং মাথার দিকে ১২.০৫ ইঞ্চি, স্তম্ভের উপর দিকে ৩½ ফুট অংশ কারুকার্য্যসমন্বিত এবং তাহাতে একটি খোদিত লিপি আছে। এই খোদিত লিপিতে কোনও তারিখের উল্লেখ নাই। লিপির অক্ষরের আকৃতি দেখিয়া প্রিন্সেপ সাহেব স্থির করিয়াছেন যে উহা তৃতীয় বা চতুর্থ খৃষ্টাব্দের অক্ষর * এবং ভাউ দাজীর মতে উহা পঞ্চম

* প্রত্নতাত্ত্বিক ফার্গুসান সাহেব লিখিয়াছেন "Taking A. D. 400 as a mean date—and it certainly is not far from the truth—it opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged

শতাব্দীর শেষ বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের অক্ষর। ফার্গুসন সাহেবের মতে উহা গুপ্ত বংশের চন্দ্ররাজাদের আমলে নির্ম্মিত, অতএব উহার লিপির তারিখ ৩১০ বা ৪১২ খৃষ্টাব্দ। আমরা এই স্তম্ভ পঞ্চম শতাব্দীর লৌহশিল্পের নমুনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। এই স্তম্ভটি একটি জয়স্তম্ভ।

পঞ্চম শতাব্দীর লৌহশিল্পের এই অদ্ভুত নিদর্শন দেখিয়া কি রাসায়নিক, কি প্রত্নতাত্ত্বিক, কি ইঞ্জিনিয়ার সকলেই আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছেন। কেহই বুঝিতে পারেন নাই কেমন করিয়া প্রাচীন হিন্দুরা এত বৃহৎ লৌহস্তম্ভ কলকারখানার সাহায্য ব্যতীত প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। *

এই স্তম্ভটি বিশুদ্ধ পেটা লোহের (wrought iron) এর দ্বারা নির্ম্মিত। জেনারাল ক্যানিংহাম ইহার এক টুকরা ডাক্তার মারে ও ডাক্তার পার্সীকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ঐ লৌহকে পেটা লৌহ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

even in Europe up to a very late date, and not frequently even now. As we find them, however, some centuries afterwards, using bars as long as this in roofing the porch of the temple at Kanarak, we must now believe that they were much more familiar with the use of this metal than they afterwards became. It is almost equally startling to find that after an exposure to wind and rains for fourteen centuries, it is unrusted, and the capital and inscription are as clear and as sharp now as when put up fifteen centuries ago"—History of Indian and Eastern Architecture Vol. II. p. 280.

দুইজন ইঞ্জিনিয়ারের মত উদ্ধৃত হইল। একজন বলিয়াছেন "Nothing heretofore brought to light in the history of metallurgy seems more striking to the reason as well as the imagination, than this fact that from the remote time when Hengist was ruling Kent and Cedric landing to plunder our barbarous ancestors in Sussex down to that of our third Henry, while all Europe was in the

(৩) ধারের লৌহস্তম্ভ।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ ভিন্ন ভারতে আরও দুইটি লৌহস্তম্ভের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ দুইটি লৌহস্তম্ভের প্রতি বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম যে ধারের লৌহস্তম্ভের বিষয় ইতিপূর্ব্বে ফারগুসান সাহেব তাঁহার History of Indian and Eastern

---

worst darkness, and confusioun of the Middle Age—when the largest and best forging producible in Christendom was an axe or a sword blade—these ancient peoples in India possessed a great iron manufacture, whose products Europe even half a century ago could not have equalled." আর একজন ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছেন "while considering forging of large masses of iron and steel, it is not easy to forget the impression caused by first seeing the Iron pillar at Delhi. This column of wrought iron, which is 16 inches in diameter, of which 22 feet are above the ground, and which is said to be 50 feet long and weighing about 18 tons, is finished perfectly round and smooth, with an ornamantal top, and was made many centuries ago from iron produced direct from the ore and built up piece by piece. Remembering the lack of facilities men had in those days for first forging and then welding together such an enormous mass makes one wonder at the iron worker of those days who must have possessed engineering ability claiming the admiration of our times. It is questionable whether the whole of the iron works of Europe and America could have produced a similar column of wrought iron so short a time ago as the Exhibition of 1851"—Presidential address to the Institute of Mechanical Engineers, London, 1905.

Architecture * নামক গ্রন্থে, কাউসেন্স সাহেব Archoeological survery † এর রিপোর্টে এবং বার্ণস সাহেব "ধার ও মাণ্ডু" ‡ নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। "Epigraphica Moslemica" § তে ঐ লৌহস্তম্ভের উপর যে পারস্য ভাষায় আকবরের খোদিত লিপি আছে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ লৌহস্তম্ভের উপর আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি সবিশেষ পতিত হয় নাই।

ধারের এই লৌহস্তম্ভ দিল্লীর লৌহস্তম্ভ অপেক্ষা বৃহত্তর। উহা সর্ব্ব সমেত ৪৩ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং দিল্লীর স্তম্ভ মাত্র ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ। এই স্তম্ভটি চতুষ্কোণ কিন্তু দিল্লীর স্তম্ভ গোলাকার। ধারের স্তম্ভটি তিনভাগে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছে—প্রথম ও বৃহত্তম খণ্ডটি সুলতান দিলওয়ার খাঁর দ্বারা নির্ম্মিত (১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ) লাট মস্‌জিদের উত্তর দিকের দরজার নিকট অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। উহা ২৪′ ৬″ লম্বা; এবং উহার সমগ্র অংশ চতুষ্কোণ। দ্বিতীয় খণ্ডটি ১১′ ৭″ লম্বা; উহার ৮′ ৬″ চতুষ্কোণ ও বাকি ৩′ ১″ অষ্টকোণ সমন্বিত। এই খণ্ডটি আনন্দ হাই স্কুলের প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে। তৃতীয় খণ্ডটি ৭′ ৬″ লম্বা এবং প্রায় সমস্ত অংশই অষ্টকোণ সমন্বিত। শেষোক্ত খণ্ডটি লালবাগ নামক সরকারী উদ্যানের দেওয়ালের গাথনির ভিতর প্রোথিত আছে। স্তম্ভটি ১০½″ চওড়া। আর একটী অংশ পাওয়া যায় না।

* Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture, revised by Messrs Burgess and Spiers, Vol. II. P. 247.

† Henry Cousens—Archœological Survey of India, Annual report, 1902-3, P. 205-212.

‡ E. Barnes, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXI.

§ Epigraphica Indo-moslemica, 1909—10, P. 13.

এই স্তম্ভের নিম্নঅংশটুকু দিল্লীর স্তম্ভের ন্যায় ঈষৎ চেপ্টা ও গোলাকার এবং এই অংশ মাটিতে প্রোথিত করিবার জন্য প্রস্তরের মধ্যে ২০″ পরিমাণে নিহিত আছে। আবার এই প্রস্তর লৌহকীলকের দ্বারা আবদ্ধ আছে। স্তম্ভের উপর আকবরের একটি খোদিত লিপি দৃষ্ট হয় এবং অন্যান্য অংশে চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দের দেবনাগর অক্ষরও খোদিত আছে। স্তম্ভের চারিপাশে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ত (১¾″ হইতে ৩″ পর্য্যন্ত) আছে। গর্ত্তগুলি সমান সমান দূরে অবস্থিত নহে, কোন কোনটি কাছে কাছে, আবার কোনটি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত।

স্তম্ভটি কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল সে বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দেখা যায়। ফার্গুসন সাহেব বলেন যে এই স্তম্ভটি দিল্লীর স্তম্ভের ন্যায় জয়-স্তম্ভ নহে, উহা কানাড়কের লৌহের কড়ির মত কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাঁহার মত হইতেছে যে উহা জয়-স্তম্ভ হইলে হয় গোলাকার হইত, না হয় কারুকার্য্য বিশিষ্ট হইত। * অপর পক্ষে কাউসেন্স সাহেব বলেন যে উহা জয়-স্তম্ভ। আমার মনে হয় যে কাউসেন্স সাহেবের মতই ঠিক। তাহার কারণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম। ভারতে আজ পর্য্যন্ত তিনটি লৌহস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার মধ্যে দুইটি জয়-স্তম্ভ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এই স্তম্ভটিও জয়-স্তম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

দ্বিতীয়। দিল্লীর জয়-স্তম্ভের মত এই স্তম্ভের নিম্ন অংশটুকু ঈষৎ চেপটা ও গোলাকার (bulbous) এবং উহা প্রস্তর ও লৌহের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে মাটিতে প্রোথিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। অতএব উহা কানাড়াকের কড়িকাষ্ঠের মত ব্যবহৃত হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা

* Fergusson, Ibid.

যায় না। পরন্তু কানাড়কে নয় খানা লৌহের কড়ি আছে, * এখানে একখানি লৌহস্তম্ভে কি "প্রয়োজনীয় কার্য্য" সিদ্ধ হইবে তাহা বুঝা যায় না।

তৃতীয়। এই স্তম্ভে কারুকার্য্যের অভাব বলিয়া ফার্গুসান উহাকে জয়-স্তম্ভ বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। লৌহের উপর কারুকার্য্য প্রস্তরের ন্যায় সহজ নহে, তবে জয়-স্তম্ভের উপর কোন একটা মূর্ত্তি বা নিদর্শন থাকে। মাউন্ট আবুর উপরের জয়-স্তম্ভের উপরে একটি ত্রিশূল আছে। এই স্তম্ভটির উপর কোন একটি মূর্ত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ সিন্ধু প্রদেশের সাধারণ শিক্ষার পরিদর্শক লেনী সাহেব ঐ স্তম্ভের কাছে একখানি প্রস্তর (capital stone) পাইয়াছিলেন, তাহা কোন মূর্ত্তির আধার ছিল বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভবতঃ গরুড়ের মূর্ত্তি উহার উপরে ছিল, কারণ মালবের হিন্দু রাজাদের মুদ্রাতে গরুড়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

চতুর্থ। স্তম্ভের চারিধারে ছোট ছোট গর্ত্ত দেখিয়া কেহ কেহ উহাকে দীপদান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু স্তম্ভটি দীপদান হইতে পারে না কারণ আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত দীপদানস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটিই লৌহ নির্ম্মিত নহে, প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত। আর গর্ত্তগুলি কোনটি দূরে কোনটি কাছে হওয়াতে মনে হয় যে স্তম্ভটি প্রস্তুত করিবার সময় crowbar এর মত কোন যন্ত্র গর্ত্তগুলির মধ্যে দিয়া ধরিয়া স্তম্ভটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

উপরোক্ত প্রমাণ পরম্পরায় মনে হয় যে স্তম্ভটি একটি জয়স্তম্ভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন উহা কাহার দ্বারা এবং কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এ বিষয় যত দূর জানা গিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ হইল। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মবিবরণীতে

* Stirling—Asiatic Researches, Vol. XV, P. 330.

লিখিয়া গিয়াছেন "এই কিল্লার (ধারের কিল্লার) বাহিরে একটি জামি মসজিদ আছে। ঐ মস্‌জিদের সম্মুখে প্রায় চারি ফুট চওড়া একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে। যখন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর সাহ মালব জয় করেন তখন তিনি উহা গুজরাটে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্তম্ভটি খুঁড়িবার সময় উহা পড়িয়া দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া যায়,—একখণ্ড ২২ ফুট এবং অপর খণ্ডটি ১৩ ফুট লম্বা। স্তম্ভটি ঐখানে অযত্নে পড়িয়া থাকাতে আমি (জাহাঙ্গীর) বড় খণ্ডটি আগ্রাতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে ঐ খণ্ডটি স্বর্গগত পিতার (আকবরের) সমাধি মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে দীপদান ভাবে ব্যবহৃত হইবে।"* জাহাঙ্গীরের আদেশ অবশ্য প্রতিপালিত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের উপরোক্ত উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর সাহের আদেশে স্তম্ভটি উত্তোলন কালে ভাঙ্গিয়া যায়। স্তম্ভের উপর আকবরের খোদিত লিপিতে তাঁহার দাক্ষি-ণাত্য জয়কালে ধারে আগমন ঘোষণা করিতেছে। এই স্তম্ভের সম্মুখে যে মস্‌জিদ মালবের সুলতান দিলওয়ার ঘোরি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "লাট-মস্‌জিদ।" এই লাট মস্‌জিদের নাম সম্মুখস্থিত লৌহের "লাট" বা স্তম্ভের নামে রক্ষিত হইয়াছিল। সুলতান দিলওয়ার ঘোরি ১৪০১খৃষ্টাব্দে মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন; অতএব তাঁহার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই "লাট" নিশ্চয়ই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মালবের জনশ্রুতি অনুসারে উহা রাজা বিক্রমাদিত্য বা রাজা ভোজের † দ্বারা নির্ম্মিত। কাউসেন্স সাহেব অনুমান করেন যে মালবের রাজা অর্জ্জুনবর্ম্মদেব যখন গুজরাট আক্রমণ করেন সেই সময়ে তিনি

---

* Turuk-i-Jahangiri, P. 201-2.

† এই ভোজ রাজা ১০১০—১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ধারের নরপতি ছিলেন। ইঁহার নাম

সময়ে পরিত্যক্ত বিপক্ষ পক্ষীয় গণের অস্ত্র শস্ত্র গলাইয়া এই স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন যে অর্জ্জুনবর্ম্মদেব ১২১০ খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভটি জয়-স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ফার্গুসন সাহেব লাট মসজিদের স্তম্ভগুলির নির্ম্মাণ প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করেন যে লৌহস্তম্ভটি দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। সবদিক দেখিয়া এই স্তম্ভের নির্ম্মাণকাল দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া লইলে বেশী ভুল হইবে না।

এই স্তম্ভ সম্বন্ধে আর একটি অনুসন্ধানের বিষয় কোন প্রকার লৌহ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। দিল্লীর স্তম্ভের লৌহের দুই টুকরা ডাক্তার মরে ও ডাক্তার পার্সীর রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা বিশুদ্ধ পেটা লৌহ (wrought iron) বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ধারের স্তম্ভের লৌহের রাসায়নিক পরীক্ষা কেহ করেন নাই। মালব প্রদেশে জনশ্রুতি এই যে ঐ স্তম্ভটি পঞ্চধাতু বা সপ্তধাতু নির্ম্মিত। এরূপ প্রবাদ দিল্লীর স্তম্ভ নির্ম্মাণ বিষয়েও শ্রুত হয়। যদি কাউসেন্স সাহেবের অনুমান সত্য হয় যে বিপক্ষ পক্ষীয় শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্র গলাইয়া এই স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা হইলে বলিতে হইবে যে উহা বহুল পরিমাণে ইস্পাতের (steel) দ্বারা গঠিত। স্তম্ভটির গাত্রে এক এক জায়গায় রূপার মত চক্‌চকে শ্বেত পদার্থ তরবারির রৌপ্য নির্ম্মিত বাঁট ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ভিন্ন এ বিষয়ের কিছু মীমাংসা হইবে না। তবে যদি অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে আমার অভিমত এই স্তম্ভটীও দিল্লীর স্তম্ভের মত পেটা লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত। ভারতে পেটা লৌহের ব্যবহারই সমধিক ছিল।

ভোজ পরমার। ইনি ঐ নামধেয় অন্য নরপতি হইতে ভিন্ন—Early History of India by V. A. Smith (Second Edition) P. 365. যদি রাজা ভোজ এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার নির্ম্মাণ কাল একাদশ শতাব্দী।

(৪) আবু শৈলের উপর লৌহস্তম্ভ।

রাজপুতানার অন্তর্গত আবু-শৈলের (Mount Abu) উপর অচলেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভারতের তৃতীয় লৌহস্তম্ভ অবস্থিত। ইহা ১৪১২ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৬ সম্বত) নির্ম্মিত। উহা ১২ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ এবং উহার মস্তকে একটি শৈব ত্রিশূল আছে। কথিত আছে যে পাঠান-সম্রাট্ আলাউদ্দিনের রাজত্বের শেষভাগে যখন চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুরা মুসলমানদিগকে হারাইয়া দিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র গলাইয়া এই স্তম্ভটি বিজয়-স্তম্ভরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিল।* ইহার লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয় নাই, তবে উহাও যে পেটা লৌহ তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৫) ভুবনেশ্বর, পুরী ও কানাড়কের লৌহের কড়ি ও লৌহকীলক।

উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দুমন্দিরসমূহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহের কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আটকাইবার জন্য লৌহকীলকের ব্যবহারও ঐ সকল মন্দিরে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। সুবিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দির সপ্তম শতাব্দীতে, পুরীর মন্দির দ্বাদশ এবং কানাড়কের মন্দির নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। এই সকল মন্দিরের নির্ম্মাণকল্পে সুবৃহৎ লৌহের কড়ি সকল ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। পুরীর লৌহের কড়িগুলি ভুবনেশ্বরের কড়িগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। পুরীতে এক শুঁড়ূচীবাড়ীতে দুইশতের উপর লৌহের কড়ি ও কীলক আছে। ষ্টার্লিং সাহেব কানাড়কে

* H. Cousens, Ann, Rep, Arch. Surv. Ind. 1902--3.

নয়খানি বৃহৎ কড়ি দেখিয়াছিলেন—ইহারা লম্বায় প্রায় ২১ ফুট ও চওড়ায় প্রায় ১০ ইঞ্চি। সম্প্রতি গ্রেভ্‌স সাহেব ২৯ খানি বৃহৎ বৃহৎ কড়ি কানাড়কে গুণিয়া আসিয়াছেন। এই সকল কড়ি পেটালৌহের দ্বারা নির্ম্মিত। * ইহার একটি ৩৫ ফুট লম্বা ও ৭ ইঞ্চি চওড়া।

(৬) লৌহনির্ম্মিত কামান।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে ভারতে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় প্রথম মোগল-সম্রাট্ বাবর প্রথমে কামান ব্যবহার করেন। তাঁহার পর মোগল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সহিত সুবৃহৎ কামান ভারতে প্রস্তুত হইত।

এই সকল কামান অধিকাংশই লৌহনির্ম্মিত। আইন আকবরীতে এই সকল কামান ও বন্দুক কিরূপে লৌহ হইতে নির্ম্মিত হইত তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মোগল-সম্রাট্‌দের আমলের যে সকল কামান এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাদের সুবৃহৎ আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে মুসলমানদের আমলেও ভারতের লৌহশিল্প যথেষ্ট সজীব ছিল। বিজাপুরের "লণ্ড কেশব" কামান ২১ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা, ইহা আরঙ্গজেবের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিজাপুরের পশ্চিমভাগে সুবিখ্যাত "হাইদার বুর্জ্জ" নামক উচ্চ মিনারের উপর যে লৌহের কামান আছে তাহা ৩০ ফুট লম্বা। গুলবর্গার কামান প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। তাহা ছাড়া মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বহুতর স্থানে মোগল-সম্রাট্‌দের সময়কার ভারতের উন্নত লৌহশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ অনেক লৌহের কামান এখনও বিদ্যমান আছে।

* যাঁহারা এই সকল বিষয় সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের "Iron in ancient India" দেখুন।

প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্পের ইতিহাস সংগ্রহ উপলক্ষে এই সকল নমুনা সংগ্রহের উপযোগিতা স্বতঃই স্বীকৃত হইবে। লৌহশিল্পের নমুনা রক্ষিত হইবার প্রধান অন্তরায় এই যে লৌহ অতি সহজেই মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। তথাপি ভারতের সর্ব্বত্র যে সকল লৌহস্তম্ভ, কড়ি, কীলক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্পবিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে হয়। প্রাচীন ভারতের যে সকল লৌহশিল্পের প্রধান প্রধান নমুনা পাওয়া যায় তাহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	স্থান	আনুমানিক কাল
লৌহমল	বুদ্ধগয়া	২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব
লৌহকীলক	বুদ্ধগয়া	ষষ্ঠ শতাব্দী
লৌহকীলক	পুরী, ভুবনেশ্বর,	অষ্টম শতাব্দী
লৌহকড়ি	কানাড়ক	ত্রয়োদশ শতাব্দী
লৌহস্তম্ভ	দিল্লী	পঞ্চম শতাব্দী
লৌহস্তম্ভ	ধার	দ্বাদশ শতাব্দী
লৌহস্তম্ভ	আবুশৈল	পঞ্চদশ শতাব্দী
লৌহকামান		ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী

এখনও বোধ হয় অনেক নমুনা ভূগর্ভে বা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে লুক্কায়িত আছে। এ বিষয়ের অনুসন্ধান কেবল প্রত্নতত্ত্বের অঙ্গ নহে, রাসায়নিকেরও অনেক উপকারে আসিবে। * বিশেষতঃ এই

* লৌহের আরও কয়েকটি নমুনা, লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল প্রভৃতি গ্রন্থকারের Iron in ancient India নামক পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

সকল লৌহের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইলে লৌহপ্রস্তুতপ্রক্রিয়ার অনেক নূতন জ্ঞান লাভ হইবে। দিল্লীর স্তম্ভ ও উড়িষ্যার লৌহের কড়ির লৌহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয় নাই। আশা করি ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সকল লৌহের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করাইয়া ভারতের লৌহশিল্পের ইতিহাস আলোচনার সহায়তা করিবেন।

লৌহপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (metallurgy)—প্রাচীন কালের লৌহপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা গিয়াছে। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে লৌহের আকর সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহাতে বুঝা যায় যে লৌহের প্রধান খনিজ গৈরিক (hematite)। গৈরিকের ব্যবহার আয়ুর্ব্বেদে অনেকস্থলে দেখা যায়। গৈরিক ছাড়া চুম্বক প্রস্তর (magnetite) ও লৌহমাক্ষিক (iron pyrites) প্রভৃতি লৌহের খনিজের উল্লেখ দেখা যায়। এখনও পর্য্যন্ত গৈরিক বা চুম্বক প্রস্তর কাঠের কয়লার সহিত চুল্লীতে উত্তপ্ত করিয়া এবং চুল্লীর ভিতর হাপরে হাওয়া (blast) দিয়া ভারতে অনেক অসভ্য জাতি লৌহ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই উপায়কে direct process বলা যায়।

এইরূপ উপায়ে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বুকানেন প্রভৃতি ভ্রমণকারীরা ভারতে লৌহ প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছিলেন। ভারতে পেটা লৌহের প্রচলনই খুব বেশী ছিল দেখা যায়। পেটা লৌহ direct processএ (অর্থাৎ এখনকার মত ঢালাই লৌহ প্রথমে প্রস্তুত না করিয়া) প্রস্তুত হইত। * অথচ যে চুল্লীতে দিল্লীর বা ধারের লৌহ স্তম্ভ বা উড়িষ্যার লৌহের কড়ি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা সুবৃহৎই ছিল এবং

* গ্রন্থকারের "Iron in ancient India" দেখুন।

এখনকার অসভ্য জাতিদের ক্ষুদ্র চুল্লীর সহিত তাহার তুলনা আদৌ হইতে পারে না।

শতপুটিত ও সহস্রপুটিত লৌহ।—নাগার্জ্জুন লৌহ-মারণের প্রবর্ত্তয়িতা। চক্রপাণি নাগার্জ্জুনপ্রবর্ত্তিত লৌহমারণ-প্রক্রিয়ার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এখানে রসেন্দ্রসারসংগ্রহ মতে পুটিত লৌহ প্রস্তুতবিধি দিলাম। রসেন্দ্রসারসংগ্রহ-লেখক নানা প্রকার লৌহের নাম করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কান্ত লৌহই (wrought iron) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।* এই সকল বিভিন্ন নামের লৌহ আজকাল পাওয়া যায় না।

এখন লৌহ হইতে পুটিত লৌহ প্রস্তুতপ্রণালীর আলোচনা করা যাউক। লৌহকে পুট দিবার পূর্ব্বে তাহাকে বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া প্রথমে ত্রিফলার কাথে মাড়িয়া "শোধিত" করিয়া লইতে হইবে। শোধনের পর তাহাকে পুনরায় ত্রিফলার কাথে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইবে, এইরূপ প্রক্রিয়া সাতবার করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার নাম "ভানু-পাক- বিধি।" তাহার পর ঐ লৌহকে ত্রিফলার কাথ, হস্তিকর্ণ-পলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতির রসের দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে।

* সামান্যাদ্‌দ্বিগুণং ক্রৌঞ্চং কালিঙ্গোঽষ্টগুণস্ততঃ।
কলেঃ শতগুণং ভদ্রং ভদ্রাদ্বজ্রং সহস্রধা ॥
বজ্রাৎ শতগুণং পাণ্ডি নিরঙ্গং দশভির্গুণৈঃ।
ততঃ কোটিসহস্রৈর্ব্বা কান্তলৌহং মহাগুণং।
"উপবিষশোধন" অধ্যায়।

এই শ্লোকটি "যুক্তিকল্পতরু" নামক সংস্কৃত পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

আর এক স্থলে :—
কিট্টাদ্দশগুণং মুণ্ডং মুণ্ডাত্তীক্ষ্ণং শতাধিকং
তীক্ষ্ণাল্লক্ষগুণং কান্তং ইত্যাদি।
ডাঃ রায়ের মতে 'মুণ্ডং' Wrought iron এবং 'তীক্ষ্ণং' steel ইস্পাত হইয়াছে।

এই প্রক্রিয়াকে "স্থালী-পাকবিধি" বলে। ইহার পর লৌহকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া "পুটপাক" করিতে হইবে। এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া এই লৌহচূর্ণকে বার বার পুট দিতে হইবে। এক শতবার এইরূপে পুট দিলে "শতপুটিত লৌহ" হইবে; সহস্রবার পুট দিলে "সহস্র পুটিত" হইবে। উহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম গুঁড়া বলিয়া জলের উপর "হংসবৎ সমুত্তরতি" অর্থাৎ হাঁসের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইবে। * এই পুট-পাকের জন্য দুই হস্তপরিমিত লম্বা চওড়া ও গভীর একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে এক হাজার ঘুঁটে সাজাইতে হইবে। তাহার উপর একখানি সরা করিয়া ঔষধ বসাইয়া আর একখানি সরা দ্বারা ঔষধ ঢাকিয়া দিতে হইবে। দুইখানি সরার মুখ মাটির দ্বারা লেপিয়া দিয়া, তাহার উপর আরও পাঁচশত ঘুঁটে দিয়া অগ্নি দিতে হইবে। এক একটি পুট একদিনের কমে হওয়া কঠিন।

আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা সকলেই এইরূপে পুটিত লৌহ প্রস্তুত করেন না। কেহ কেহ লৌহকে গোমূত্রে বহুদিবস যাবৎ ডুবাইয়া রাখেন, তাহার পর লৌহে যে মরিচা ধরে সেইগুলি লইয়া পুটপাক করেন। কেহবা লৌহকে কামারদের হাপরে পোড়াইয়া যে মরিচা পাওয়া যায় তাহাই লইয়া থাকেন। শেষোক্ত মরিচাকে "মণ্ডুর" বলে। অপর কেহ কেহ হিরাকসকে পুটপাক করিয়া যে ঈষৎ লালবর্ণের লৌহ-ভস্ম পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করেন। এই সকল বিভিন্ন উপায়ে লৌহ প্রস্তুত করিয়া আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা ভালই করিয়াছেন—ইহাতে কোনও দোষ করেন নাই।

* বাজীকর্ম্মণি বিজ্ঞেয়ো দশাদি শতপঞ্চকঃ॥
তাবদেব পুটেল্লোহং যাবচ্চূর্ণীকৃতং জলে।
নিস্তরঙ্গে লঘুত্বেন সমুত্তরতি হংসবৎ॥ রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ।

পুটিত লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য আমরা অনেক স্থান হইতে পুটিত লৌহ আনয়ন করি। ঔষধের নমুনা লইয়া আমাদিগকে অনেক গোলে পড়িতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত ঔষধ বর্ণে মিলে না—কোনও লৌহভস্ম কালো, কোনটি ঈষৎ কালো, অধিকাংশ ঈষৎ লাল বর্ণের, কোনটি বা ঘোর লাল বর্ণের। কোনটি জলে "হংসবৎ সমুত্তরতি," কোনটি বা জলে ডুবিয়া যায়। প্রসিদ্ধ সাবাড় নামক স্থান হইতে আনীত লৌহ ঈষৎ লাল বর্ণের, কিন্তু জলে ভাসে নাই। আমরা ঈষৎ লাল বর্ণের লৌহভস্ম লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি—কারণ ঐ বর্ণ ই অধিকাংশ লৌহভস্মে দেখিলাম। একজন কবিরাজ বন্ধু ক্রমান্বয়ে এক পুটিত, দশ পুটিত ও ৭৮ বার পুটিত লৌহের নমুনা দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

এক পুটিত লৌহ চুম্বক দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়, ১০ বার পুটিত লৌহ অল্প পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, ৭৮ বার পুটিত অতি সামান্যভাবে ও শত পুটিত এবং সহস্র পুটিত আদৌ আকৃষ্ট হয় না। ইহাদের বর্ণ কালো হইতে ক্রমে ক্রমে লাল হইয়াছে। চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে অল্প পুটিত লৌহে লৌহ ধাতুরূপে আছে, কিন্তু পরীক্ষায় জানা গেল যে এক পুটিত লৌহে অতি সামান্য ভাগ লৌহ ধাতু আকারে আছে এবং অন্যগুলিতে লৌহ ধাতুরূপে আদৌ নাই। ইহাদের চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবার কারণ এই যে অল্প পুটিত লৌহে ফেরসোফেরিক অক্সাইড্ (Ferroso-ferric oxide) নামক লৌহের একটি যৌগিক পদার্থ (Compound) আছে। *

* যাঁহারা এ বিষয় সবিশেষ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১৯১০ সালের বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রকাশিত গ্রন্থকার ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রভূষণ অধিকারীর প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

অম্লজানের (Oxygen) সহিত লৌহের তিনটি যৌগিক পদার্থ আছে। একটির নাম ফেরাস্ অক্সাইড্ (Ferrous Oxide), ইহাতে অম্লজানের ভাগ অল্প। আর একটির নাম ফেরিক্ অক্সাইড্ (Ferric Oxide), ইহাতে অম্লজানের ভাগ বেশী। এই দুইটির সংমিশ্রণে আরও একটি যৌগিক উৎপন্ন হয়, তাহাকে ফেরসো-ফেরিক অক্সাইড্ বলে। এই শেষোক্ত যৌগিকটির চুম্বক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে।

নিম্নে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হইল।

এক পুটিত লৌহ।

লৌহ ধাতু	...	...	যৎসামান্য।
ফেরস্ অক্সাইড্	...	...	৬৮·১
ফেরিক্ অক্সাইড্	...	...	২০·৪
বালুকাময় পদার্থ (Siliceous Matter)		...	১০·১
জলে দ্রবণীয় পদার্থ (Soluble Salt)		...	১·৩
			৯৯·৯

দশ পুটিত লৌহ।

লৌহ ধাতু	...	...	নাই।
ফেরস্ অক্সাইড্	...	...	২৩·১
ফেরিক্ অক্সাইড্	...	...	৪০·০
বালুকাময় পদার্থ	...	...	৩২·১
জলে দ্রবণীয় পদার্থ	...	...	৪·৬
			৯৯·4

৭৮ বার পুটিত লৌহ।

লৌহ ধাতু	নাই।
ফেরস্ অক্সাইড্	৯·৫
ফেরিক্ অক্সাইড্	৫১·২
বালুকাময় পদার্থ	৩৪·১
জলে দ্রবণীয় পদার্থ	৫·৪
	১০০·২

শত পুটিত লৌহ।

(ভিন্ন নমুনা)

লৌহ ধাতু	নাই।
ফেরস্ অক্সাইড্	নাই।
ফেরিক্ অক্সাইড্	৮৩·৯
বালুকাময় পদার্থ	১২·৭
জলে দ্রবণীয় পদার্থ	৩·৭
	১০০·৩

সহস্র পুটিত লৌহ।

লৌহ ধাতু	নাই।
ফেরস্ অক্সাইড্	নাই।
ফেরিক্ অক্সাইড্	৭৮·১
বালুকাময় পদার্থ	১৭·৯
জলে দ্রবণীয় পদার্থ	৪·১
	১০০·১

সহস্র পুটিত লৌহ।

(ভিন্ন নমুনা)

লৌহ ধাতু	...	...	নাই।
ফেরস্ অক্সাইড	...	...	নাই।
ফেরিক্ অক্সাইড্	...	...	৮৪.৯
বালুকাময় পদার্থ	...	...	১১.৩
জলে দ্রবণীয় পদার্থ	...	...	৩.৮
			৯৯.৭

উল্লিখিত রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল হইতে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবগত হইতেছি।

(১) অল্প পুটিত লৌহে ফেরস্ অক্সাইড্ খুব বেশী থাকে, ক্রমে যত পুট বেশী দেওয়া যায় ততই ফেরস্ অক্সাইড্ ফেরিক্ অক্সাইডে পরিণত হয়। আয়ুর্ব্বেদে পুটপাক বদ্ধ পাত্রে করিতে হয়, দুইখানি সরার মধ্যে ঔষধ রাখিয়া মুখ মাটি দিয়া লেপিয়া দিতে হয়, সেই জন্য ফেরস্ অক্সাইড্কে ফেরিক্ অক্সাইডে পরিণত করিতে অত অধিকবার পুট দিতে হয়। যদি ঐ ফেরস্ অক্সাইড্কে মুখ খোলা পাত্রে (যথা কড়া ইত্যাদি) অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করা যায় এবং ক্রমাগত নাড়িতে থাকা যায়, তাহা হইলে একবারেই ফেরস্ অক্সাইডকে ফেরিক্ অক্সাইডে পরিণত করা যায়।* বায়ুতে যে অম্লজান আছে তাহা ফেরস্ অক্সাইডের সহিত সংযুক্ত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফেরিক্ অক্সাইডে পরিণত

* ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত—"নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" ১৩-১৪ পৃঃ ও ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করে। যদি একদিনে একটি পুট সম্পন্ন হয় তাহা হইলে শত পুটিত লৌহ প্রস্তুত করিতে তিন মাসের অধিক ও সহস্র পুটিত লৌহ প্রস্তুত করিতে প্রায় তিন বৎসর লাগে !!! কিন্তু বার বার পুট দেওয়া আর গুঁড়ানর দরুণ এই লৌহভস্ম খুব সূক্ষ্ম। সাধারণ ফেরিক অক্সাইড জলে ভাসে না। বোধ হয় এই সূক্ষ্মত্বের দরুণ কবিরাজী লৌহ বেশী উপকারী।

(২) শত পুটিত ও সহস্র পুটিত লৌহের কোন রাসায়নিক প্রভেদ নাই। উভয়ই অবিশুদ্ধ ফেরিক্ অক্সাইড্। শতকরা ৭৮ হইতে ৮৪ ভাগ ফেরিক্ অক্সাইড্ আছে।

(৩) উভয় প্রকার লৌহই অত্যন্ত অবিশুদ্ধ (impure)। উহাতে শতকরা ১৬ হইতে ২২ ভাগ অন্য জিনিস আছে। এই আবর্জ্জনার মধ্যে অধিকাংশ বালুকাময় পদার্থ। অপর একটি পুটিত লৌহে আবর্জ্জনার মাত্রা শতকরা ৪০ ভাগও আছে। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম এই সকল আবর্জ্জনা মাটির সরা হইতে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য হইতে আসিয়া থাকে। পরে অবগত হইলাম যে লৌহকে পাথরের শীলে গুঁড়ান হয়, সেই জন্য এত বালি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কাংস্য ও পিত্তল।

প্রাচীন ইতিহাস—কাংস্য ও পিত্তলের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নাই। সুশ্রুত কাংস্যের গুণবর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু পিত্তলের করেন নাই। পুনশ্চ সুশ্রুতে কাংস্য পাত্রে (ও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মণিময় ও মৃন্ময় পাত্রে) জল পানের ব্যবস্থা আছে, ঐ স্থানে পিত্তলের উল্লেখ নাই। মহাভারতেও কাংস্যের উল্লেখ আছে, পিত্তলের নাই। মনু কাংস্য ও পিত্তলের তৈজসের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য মনে হয় যে ভারতে পিত্তলের প্রচলন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব বা পরে প্রথম শতাব্দী হইতে হইয়াছে। অমরকোষে (ষষ্ঠ শতাব্দী) পিত্তল ও কাংস্য দুইয়েরই উল্লেখ আছে। অমরসিংহের সমসাময়িক বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাতেও রীতি বা পিত্তলের উল্লেখ দেখা যায়। রসরত্নসমুচ্চয় (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ও রসেন্দ্রসারসংগ্রহে (চতুর্দ্দশ শতাব্দী) পিত্তল ও কাংস্য "লোহানি" বা ধাতুবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ভাবপ্রকাশে (ষোড়শ শতাব্দী) পিত্তল ও কাংস্য উপধাতু (semi-metal) বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পিত্তল তাম্র ও যশদের এবং কাংস্য তাম্র ও বঙ্গের উপধাতু।

কাংস্য অর্থে ব্রঞ্জ ও কাঁসা (bell-metal) দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক ব্রঞ্জ ধাতু প্রধানতঃ তাম্র ও বঙ্গ এই ধাতুর মিশ্রণে প্রস্তুত হয়, ঐ দুই ধাতুর সহিত যশদও কখনও কখনও মিশ্রিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালেও কাংস্য তাম্র ও বঙ্গ গলাইয়া প্রস্তুত হইত। কাংস্য বেল-মেটাল অর্থেও যে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ এই যে অমরকোষে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে "কাংস্যতালের" (কাঁসর) উল্লেখ আছে।

ইউরোপের অনেক দেশে লৌহযুগের পূর্ব্বে ব্রঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া কথিত হয়। প্রস্তরযুগের পর ব্রঞ্জযুগ, তাহার পর লৌহযুগ। ভারতে কিন্তু ব্রঞ্জনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র খুব কমই পাওয়া যায়, যে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতে যে একটি ব্রঞ্জযুগ প্রচলিত ছিল—এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। * কিন্তু ব্রঞ্জ ধাতু যে তৈজসাদি প্রস্তুতকল্পে প্রাচীনকাল হইতে ভারতে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। মাদ্রাজের অন্তর্গত টিনেভেলী নামক স্থান খনন কালে বিস্তর শবাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে লৌহের অস্ত্রাদি ও ব্রঞ্জের বিবিধ তৈজস ও গহনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। † বাহুল্য ভয়ে সে গুলির বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না। এই ব্রঞ্জের তৈজসাদি খুব প্রাচীন কালের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে (অষ্টম হইতে দশম শতাব্দী) বঙ্গদেশ ব্রঞ্জশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। লামা তারানাথের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে গৌড়ের রাজা দেবপাল ও ধর্ম্মপালের সময় বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী ধীমান্ ও তৎপুত্র বিটপাল বাঙ্গালায় ব্রঞ্জশিল্পের অগ্রণী ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ হইতে ব্রঞ্জশিল্প নেপাল ও তিব্বত দেশে উপনীত হইয়াছিল ‡। ঐ শিল্পের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

পিত্তল প্রধানতঃ তৈজস ও দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হইত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাংরার নিকট ফতেপুর নামক গ্রামের একটি ধর্ম্ম-

* Vincent smith, Indian Antiquary, 1905, p. 240-244; Indian Antiquary, 1907. p. 53-53.

† Annual Report, Archeological Survey of India, 1902--3.

‡ Vincent smith, A History of fine art in India & Ceylon. p. 305.

শালায় একফুট উচ্চ ও প্রায় সাত ইঞ্চি চওড়া পিত্তলনির্ম্মিত একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহার খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে মূর্ত্তিটি ষষ্ঠ শতাব্দীর। মধ্য যুগের একটি সুন্দর ও বৃহৎ পিত্তলমূর্ত্তি ঢাকার নবগঠিত মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়মে মধ্যযুগের কয়েকটি ছোট ছোট পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ (Burma) পিত্তলের জন্য বিখ্যাত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিত্তলের বুদ্ধমূর্ত্তি ও ঘণ্টার জন্য ব্রহ্মদেশ প্রসিদ্ধ। ভারতেও বিবিধ স্থানের মন্দিরে অনেক ঘণ্টা আছে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মদেশের ঘণ্টাগুলির সহিত আকৃতিতে তাহাদের তুলনাই হয় না। ব্রহ্মদেশে সিউ—ডেগং—পয়া নামক মন্দিরে যে পিতলের সুবৃহৎ ঘণ্টা আছে, তাহার ওজন প্রায় ১১২০ মোণ (৪১ টন)। উহা ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সিম্বু সিন্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মিংগুইন সহরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে যে ঘণ্টা আছে তাহা জগতের যত বৃহৎ ঘণ্টা আছে তাহার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। * উহা প্রায় চারি জন মানুষের সমান উচ্চ এবং মুখের ব্যাস .৬ ফুট এবং ওজন প্রায় ২৪৮৪ মোণ (৮৮ টন)।

* রুষিয়ার অন্তঃপাতী মস্কাউ নগরের ঘণ্টাই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টা। উহার ওজন ৩৫৪৮ মোণ (১২৮ টন)। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ব্রঞ্জের মূর্ত্তি রোডস (Rhodes) দ্বীপে গ্রীক দেবতা হিলিয়সের (সূর্য্য) মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি ৭০ হাত উচ্চ এবং জগতের সাতটি আশ্চর্য্যের অন্যতম ছিল। লিন্ডাস নিবাসী কারস নামক কারিগর উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং নির্ম্মাণকার্য্যে ১২ বৎসর লাগিয়াছিল। মূর্ত্তিটি স্থাপিত হইবার ৫৬ বৎসর পরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২২৪ অব্দে ভূমিকম্পে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ভগ্নাবস্থায় উহা প্রায় হাজার বৎসর পড়িয়াছিল, পরে স্যারাসেন্‌সরা রোডস দ্বীপ দখল করিলে পর সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ঐ ভগ্নমূর্ত্তির অংশগুলি এক ইহুদিকে বিক্রয় করেন। সেই ইহুদিকে প্রায় ৯০০ উষ্ট্রের দ্বারা সমস্ত ধাতুখণ্ডগুলি স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ বোদে পয়া ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সিংহল দ্বীপেও মধ্য যুগের অনেকগুলি পিত্তল ও ব্রঞ্জ ধাতুর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

ধাতুপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া (metallurgy)—পিত্তল—ভাবপ্রকাশকার লিখিয়াছেন যে তাম্র ও যশদ এই উভয় ধাতুর উপধাতু পিত্তল। পিত্তলের গুণ তাহার উপাদান কারণের তুল্য। * অতএব তাম্র ও যশদ (দস্তা) একত্র গলাইয়া পিত্তল প্রস্তুত হইত। আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে মোগল আমলে দুই সের তাম্র ও দেড় সের যশদ গলাইয়া পিত্তল প্রস্তুত হইত।

কাংস্য—রসরত্নসমুচ্চয়কার লিখিয়াছেন যে ৮ ভাগ তাম্র ও ২ ভাগ বঙ্গ (tin) গলাইয়া কাংস্য প্রস্তুত হয়। †

পিত্তল ও কাংস্যের শোধন—ভাবপ্রকাশের মতে কাঁসা ও পিত্তল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত করত অগ্নিতে পোড়াইয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথে প্রত্যেক দ্রব্য তিনবার করিয়া নিমগ্ন করিলে কাঁসা ও পিত্তল বিশুদ্ধ হইবে। পোড়াইবার সময় এই সকল ধাতু খানিকটা আক্‌সাইডে (oxide) পরিণত হইবে।

পিত্তল ও কাংস্যের মারণ—কাংস্যপত্রের সমপরিমাণ গন্ধক লইয়া আকন্দের আটা দ্বারা মর্দ্দনান্তর কাংস্যপত্র লেপন করত অম্লরসে নিমগ্ন করিয়া সংশোধন করিবে, তৎপরে উহা একটি মুষামধ্যে স্থাপন করত

---

* রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাত্তাম্রস্য যশদস্য চ।
পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ॥ ভাবপ্রকাশ।

† অষ্টভাগেন তাম্রেণ দ্বিভাগকুটিলেন চ।
বিদ্রুতেন ভবেৎ কাংস্যং.........রসরত্নসমুচ্চয়॥

দুইবার গজপুটে পাক করিলেই কাংস্য মারিত হইবে। পিত্তলও এই নিয়মে মারিত হয়। *

রাসায়নিক বিশ্লেষণ।—পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মারিত হইলে কাংস্যভস্ম কপার সল্ফাইড (copper sulphide) এবং ষ্ট্যানস্ সল্ফাইড (stannous sulphide) এর মিশ্রণ হইবে; এর পিত্তলভস্ম কপার সল্ফাইড্ (copper sulphide) এবং জিঙ্ক সল্ফাইডের (zinc sulphide) এর মিশ্রণ হইবে। কাংস্যভস্ম ও পিত্তলভস্ম উভয়েই দেখিতে কালোবর্ণের গুঁড়া। রাসায়নিক পরীক্ষাতেও এই দুই প্রকার ভস্ম যথাক্রমে উপরোক্ত সল্ফাইড দ্বয়ের মিশ্রণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

---

* অর্কক্ষীরেণ সংপিষ্টো গন্ধকস্তেন লেপয়েৎ।
সমেন কাংস্যপত্রাণি শুদ্ধাম্লদ্রবৈর্মুহুঃ॥
ততো মুষাপুটে ধৃত্বা পচেদ্গজপুটেন চ।
এবং পুটদ্বয়াৎ কাংস্যং রীতিশ্চ ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥ ভাবপ্রকাশ।

পরিশিষ্ট।

বিবিধ ধাতুর প্রাচীন নমুনা।

স্বর্ণ।

পূর্ব্বে বিবিধ ধাতুর যে সকল প্রাচীন নমুনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ভিন্ন আরও অনেকগুলি নমুনা এখানে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে ভারতের উন্নত প্রাচীন ধাতু শিল্পের পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে। স্বর্ণের প্রাচীন নমুনা অবশ্য স্বর্ণমুদ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ভিন্ন কয়েকটি স্বর্ণনির্ম্মিত মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিমরান স্তূপে আবিষ্কৃত স্বর্ণ-আধার (casket)।

কাবুল ও জালালাবাদের মধ্যে যে রাজপথ গিয়াছে তাহার উত্তরে দুই নম্বর বিমরাণ স্তূপের ভিত্তি খনন করিয়া মেসন সাহেব এই স্বর্ণ-নির্ম্মিত আধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে বিলাতের ব্রিটিস মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই আধারটি খাঁটি স্বর্ণের নির্ম্মিত, গোলাকার, ২৮ ইঞ্চি উচ্চ ও উহার ব্যাস ২ ইঞ্চি। ইহা মণিখচিত এবং বিবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত। কারুকার্য্যগুলি অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রাচীন উন্নত স্বর্ণশিল্পের পরিচায়ক। ইহার সহিত প্রাপ্ত রাজা প্রথম এজেসের (Azes I) নবনির্ম্মিত মুদ্রাদৃষ্টে উহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। *

---

* Vincent Smith, "A History of fine art in India and Ceylon." p. 356.
Birdwood's "Industrial Arts of India"

স্বর্ণনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি।

ব্রিটিস মিউজিয়মে স্বর্ণনির্ম্মিত একটি ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। উহা খুব সম্ভবতঃ কোনও বৌদ্ধ স্তূপ হইতে প্রাপ্ত। মূর্ত্তিটি প্রায় ৫ অঙ্গুলি উচ্চ। মূর্ত্তির আকৃতি দেখিয়া উহা ষষ্ঠ শতাব্দীর মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। * সিংহলে এইরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্য মূর্ত্তি অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। †

স্বর্ণের অলঙ্কার।

বৌদ্ধ যুগের অনেকগুলি স্বর্ণের গহনার বিষয় মার্সাল সাহেব কৃত "Buddhist gold jwellery" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে ‡। কর্ণেল এইচ, এ, ডিন (Col. H. A. Deane) নামক একজন সাহেব ১৩টি প্রাচীন স্বর্ণালঙ্কার লাহোর মিউজিয়মে প্রদান কারিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উসুফারি জিলায় তরধার নামক গ্রামে প্রাচীন ভগ্ন বৌদ্ধস্তূপ হইতে প্রাপ্ত অনেকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ডিন সাহেব গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে হার, কর্ণভূষণ, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি ছিল এবং ইহাদের সঙ্গে হুবিষ্ক ও কণিষ্কের কয়েকটি মুদ্রা এবং উহার সহিত প্রাপ্ত একটি পাত্রে মানুষের পায়ের মধ্যম অঙ্গুলির আধপোড়া হাড়ও ছিল। আর কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার রাওলপিণ্ডির কোনও বিক্রেতার নিকট ক্রীত হইয়াছিল ; কিন্তু গঠনপারিপাট্যের সমতা দেখিয়া মার্সাল সাহেব

---

* V. Smith, ibid. p. 358.

† Indian Antiquary, xiii, 15.

‡ Marshal's "Buddhist gold jewellery" (An. Rep. Arch. Sur. India, 1902 3, pp. 185- 194).

পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণালঙ্কারের সমসাময়িক সময়ে এইগুলিও নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে এইগুলিও তরধারের স্বর্ণালঙ্কারের সহিত ছিল। এই সকল স্বর্ণালঙ্কার মণিমাণিক্যখচিত এবং ইহাদের কারুকার্য্য খুব উচ্চাঙ্গের। হুবিষ্ক ও কণিষ্কের মুদ্রা দৃষ্টে ও গঠনপ্রণালী বিচার করিয়া মার্সাল সাহেব এই অলঙ্কারগুলি তৃতীয় খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মাদ্রাজের অন্তর্গত টিনভেলী জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুপ্রাচীন কবরের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রাচীন কবর খনন করিয়া বহুসংখ্যক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল কবরের ভিতর শবাধারে নরকঙ্কালের সহিত ব্রঞ্জ ধাতুর তৈজস ও লৌহের অস্ত্রশস্ত্র এবং মৃত্তিকার তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার সহিত অনেকগুলি শবাধারের ভিতর বাজুবন্ধের মত স্বর্ণের গহনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই স্বর্ণালঙ্কারগুলি বাজুবন্ধ নহে, মাদ্রাজ অঞ্চলে বহুপ্রাচীন প্রথা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির মস্তকে বা কপালে এই সকল স্বর্ণালঙ্কার বাঁধিয়া দেওয়া হইত। * এই সকল স্বর্ণের অলঙ্কার অনৈতিহাসিক কালের।

স্বর্ণের গিল্টিকরণ।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে তাম্রের উপর সুবর্ণ-পত্র জড়াইয়া পরে ঘসিয়া চক্‌চকে করিয়া গিল্টিকরণের প্রথা দৃষ্ট হয়। এইরূপ গিল্টিকরা তাম্রের প্রাচীন নমুনা ভারতে পাওয়া যায়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে খোদিতলিপিসমেত একটি গিল্টিকরা তাম্র-চূড়া ও ছত্র এক্ষণে ইণ্ডিয়ান মিউ-

* A. Rey, Prehistoric antiquities in Tinnevelly, Annual Report of Archæological Survey of India, 1902-3, p. 120.

জিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। উহা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, তবে উহা স্বর্ণপত্র জড়াইয়া গিল্টিকরা হইয়াছে বা কোন প্রকার রং দিয়া করা হইয়াছে তাহা সঠিক জানা নাই।

রাজপুতানায় তাম্র, রৌপ্য ও টিনের আকর।

রাজপুতানায় রৌপ্য ও তাম্রের খনি ছিল তাহার সঠিক প্রমাণ টড (Tod) সাহেবের রাজস্থান পাঠে জানা যায়। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে চিতোরের রাজা লক্ষ রাণা তাঁহার রাজ্যে টিন, রৌপ্য ও তাম্রের খনি আবিষ্কার করিয়া উহার আয় হইতে রাজ্যের যথেষ্ট সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। টড সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন * :—

"লক্ষ রাণা নরহত্যার দ্বারা ১৪৩৯ সালে (সম্বত, ১৩৭৩ খ্রীঃ অঃ) চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই মারোয়ারের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিলেন এবং তাহাদের প্রধান দুর্গ বেরাটগড় ভগ্ন করিয়া দিয়া তথায় বেদনগর সংস্থাপন করিলেন। এইরূপে স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ বশীভূত করিয়া তিনি ইহা অপেক্ষা এক অধিক কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার রাজ্যের সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি জোয়ারা প্রদেশে রৌপ্য ও বঙ্গের (টিন) খনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রদেশ ছাপ্পানের ভীলগণের নিকট হইতে খেৎসিং দখল করিয়া লইয়াছিলেন। লক্ষ রাণা এই সকল খনি হইতে রীতিমত ধাতু আহরণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, এই সকল খনি চিতোরের স্থাপয়িতার সময় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সপ্ত ধাতুই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ইহা কাল্পনিক বলিয়াই

* Tod's Rajasthan. Vol. I., p, 274.

মনে হয়। স্বর্ণ যে পাওয়া যাইত তাহার কোন প্রমাণ নাই। রৌপ্য, টিন, তাম্র, সীসক ও এণ্টিমণি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, কিন্তু অনেক বৎসর ধরিয়া যে টিন পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে রৌপ্য খুব অল্পই থাকিত।" রাজপুতানায় এখনও তাম্র ও তুঁতের কারখানা আছে।

এক্ষণে এই দুই ধাতুর প্রাচীন কয়েকটি নমুনার পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

অশোকস্তম্ভে তাম্রকীলক।

অধিকাংশ অশোকস্তম্ভ একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে প্রস্তুত। কিন্তু নেপালরাজ্যের সীমান্তপ্রদেশস্থ রামপুরা নামক গ্রামে একটি ভগ্ন অশোকস্তম্ভ হইতে একটি বৃহৎ তাম্রকীলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এচ, বি, ডব্লিউ গেরিক (Mr. H. B. W. Garrick) সাহেব উহা কলিকাতার মিউজিয়মে দান করিয়াছেন। এই কীলকটি গোলাকার এবং অশোক-স্তম্ভের দুইখানি প্রস্তর আটকাইবার জন্য স্তম্ভের মধ্যদেশে সন্নিবিষ্ট ছিল। কলিকাতার মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে উহা সংরক্ষিত আছে। আমি উহার মাপ লইয়াছিলাম। উহা লম্বে ২৪½ ইঞ্চি, মাঝখানের পরিধি ১৪ ইঞ্চি ও দুই ধারে অপেক্ষাকৃত সরু বলিয়া ধারের পরিধি ১২ ইঞ্চি। উহার ওজন লইবার কোনও সুবিধা ছিল না; তবে এক জনে খুব কষ্টে উহা উত্তোলন করিতে পারে। দেখিয়া বোধ হয় যে উহা ব্রঞ্জ (bronze) আদৌ নহে, বিশুদ্ধ তাম্রের দ্বারা প্রস্তুত। অশোকের সময়ে এত বড় বৃহৎ তাম্রকীলক প্রস্তুত হওয়া গৌরবের কথা। *

* Garrick, Report of tours in North and South Behar, 1810-1881, Arch. Sur. Ind. Vol. XVI., p. 113.

গুঞ্জেরিয়া গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রের অস্ত্রশস্ত্র ও রৌপ্যের দ্রব্যাদি।

বালাঘাটের ডেপুটী কমিশনার এ, ব্লুমফিল্ড সাহেব ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বালাঘাটের অন্তর্গত মাউ তালুকভুক্ত গুঞ্জেরিয়া গ্রামের এক স্থান খনন কালে ভূমধ্য হইতে ২২৪ খণ্ড তাম্র ও ১০২ খণ্ড রৌপ্য প্রাপ্ত হন। * তিনি উহার মধ্যে ৮ খণ্ড রৌপ্য ও ১৭ খণ্ড তাম্রের তৈজসাদি এসিয়াটিক সোসাইটিকে উপহার প্রদান করেন। এক্ষণে উহা কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এই ৪২৪ খণ্ড তাম্রের ওজন ১০ মণ ১৪½ সের ও ১০২ খণ্ড রৌপ্যের ওজন ১ সের অর্দ্ধ তোলা। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির মে মাসের সভায় পঠিত হয়। তাম্রের তৈজসাদি অধিকাংশই শাবল, খোন্তা, কুঠার, লাঙ্গলের ফাল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসগুলি কি জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা সঠিক নির্ণীত হয় নাই। ঐ গুলি সমস্তই পাতলা রৌপ্যের চাকৃতি হইতে প্রস্তুত, একখানি গোলাকার, অপরগুলি গোলাকার বটে কিন্তু উহাদের মুখগুলি গরুর শৃঙ্গের মত বাঁকান কিন্তু উল্টা। যে সভায় ঐ প্রবন্ধ পঠিত হয় সে সভায় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং অপর কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে রৌপ্য-নির্ম্মিত দ্রব্যগুলি হিন্দুর কোন ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত হইত।

তাম্রের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি লম্বে ২৩¾, ২১½ ও ১৭½ ইঞ্চি এবং ধারাল দিকে চওড়ায় ৩ বা ৪ ইঞ্চি। অপর কতকগুলি লম্বে ৮¾ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৬¼ ইঞ্চি। অধিকাংশ অস্ত্রই ¾ ইঞ্চি পুরু।

---

* Bloomfield, Proceedings of the Asiatic society of Bengal, 1870. P. 131.

রৌপ্যের চাকৃতিগুলি এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গ পর্য্যন্ত ৪½, ৫ ও ৫½ ইঞ্চি চওড়া। অপর দিকের ব্যাস ৪ হইতে ৫½ ইঞ্চি।

যে স্থান হইতে ঐ গুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সে স্থানটা পোড়ো জমি। সকলগুলি এক স্থানেই ছিল। তিন ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া ও ৪ ফুট গভীর এক গর্ত্ত খনন করিয়া উহাদিগকে উত্তোলন করা হয়।

এই তাম্র ও রৌপ্যের রাসায়নিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এ, টুইন সাহেব পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে তাম্রনির্ম্মিত তৈজসগুলি বিশুদ্ধ তাম্রের দ্বারা প্রস্তুত, উহাতে শতকরা ১৷৹ ভাগ সীসক আছে। রৌপ্যও বিশুদ্ধ, মাত্র শতকরা .৩৭ ভাগ স্বর্ণ আছে।

এই তাম্র ও রৌপ্য কোন্ শতাব্দীর তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। যেস্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল সে স্থানটা পতিত জমি, আশেপাশে কোনও ঐতিহাসিক স্থান বা মন্দিরাদি নাই। কেবল ঐ স্থানের তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটি বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তবে এটা ঠিক যে, এই তাম্র ও রৌপ্য অনৈতিহাসিক কালের। প্রাচীন নমুনা দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় যে পৃথিবীর অপরাপর দেশ অপেক্ষা ভারতে লৌহযুগ প্রাচীনতর কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত দিল্লার লৌহস্তম্ভ দৃষ্টে বেশ প্রতীয়মান হয় যে তাহার অনেক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে লৌহযুগ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। অশোকস্তম্ভের তাম্রকীলক দৃষ্টে মনে হয় যে তাম্রযুগ অশোকেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। এতএব গুঙ্গেরিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্র ও রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসাদি অশোকযুগেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ঋগ্বেদে লৌহের ভূরি উল্লেখ দৃষ্টে মনে হয় ভারতে লৌহযুগ অতি প্রাচীন। কিন্তু ঐ বেদে তাম্রের উল্লেখ না থাকাতে এবং অথর্ব্ববেদে ও ব্রাহ্মণগুলিতে তাম্রের উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে ভারতে তাম্রযুগ লৌহযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, লৌহযুগের

সমকালবর্ত্তী। এই অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে ঐগুলি পূর্ব্বে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই—নূতন অবস্থাতেই আছে। এতগুলি তাম্র ও রৌপ্যের নূতন তৈজসাদি একস্থানে প্রাপ্ত হওয়াতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, ঐস্থানে নিশ্চয়ই তাম্র ও রৌপ্যের কারখানা বা দোকান ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাম্রনির্ম্মিত আরও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

রাজপুতনায় আবিষ্কৃত তাম্রদ্রব্যাদি।

রাজপুতনার অন্তর্গত নাগর নামক একটী স্থানের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্লাইল সাহেব (Mr. Carllyle) ভূগর্ভ হইতে অনেক দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে তাম্রের আংটী, পাত, চাবি, চরকার কাটী (spindle), তার, প্রভৃতি বিবিধ তাম্রঘটিত দ্রব্য বহুলপরিমাণে ছিল। * এখানে তাম্রের যে একটা কারখানা ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই নাগর নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ অতি প্রাচীন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে উহার স্থাপয়িতা যদুবংশের শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। এই প্রবাদ ছাড়িয়া দিলেও ঐস্থানে প্রাপ্ত বহু সংখ্যক মুদ্রাই উহার প্রাচীনত্ব ঘোষিত করিতেছে। কার্লাইল সাহেব এস্থান হইতে ছয় সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম তাহার মধ্যে ছয়শত মুদ্রা অশোকাক্ষরে খোদিত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং উহাদের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ অব্দ হইতে ২৮০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কার্লাইল

* তাম্রঘটিত এই সকল বিবিধ তৈজসাদির পরিচয় Archæological Survey of India Report Vol. VI. p. 162-195 এবং Archæological Survey of India Report Vol. XII. P. 363 দেখুন।

সাহেব মনে করেন যে সুবিখ্যাত পম্পে (Pompey) নগরের মত এই স্থান সহসা আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাম্রনির্ম্মিত প্রাচীন বুদ্ধ মূর্ত্তি।

তাম্রনির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তির বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। উহা সাড়ে ৭ ফুট উচ্চ। ভাগলপুরের অন্তর্গত সুলতানগঞ্জ নামক স্থানে একটি প্রাচীন ভগ্ন বিহারের মধ্যে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া যায় এবং এক্ষণে উহা বিলাতে বার্মিংহামের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই মূর্ত্তির পরিচ্ছদ অতি সুন্দর স্বচ্ছপ্রায় তাম্রপত্রের নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তির গঠনপ্রণালী হইতে এবং উহার সন্নিকটে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা দৃষ্টে উহা ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে *। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের

---

* V. Smith, Ibid, p. 172.

Journal, Asiatic Soc, Beng. Vol. xxxiii, 1864, p. 361.

তিব্বতেও তাম্রশিল্প প্রাচীনকাল হইতে এখনও প্রচলিত আছে—

"Copper is found both native and in the form of pyrites in Tibet, where it is wrought with uncommon perfection, Several localities are well-known for their famous foundries, which supply the whole of the Buddhist East with statuettes of divinities. Lhassa has a special reputation for small figures in gilt copper, which are esteemed the more the smaller they are. Its productions are easily recognised by their graceful and somewhat arch style. The statuettes made by the monks and craftsman of Tashilumpo are equally esteemed. Most of the bronze statuettes come from the workshops of the Tsang and Khanes provinces. The bronzes from the region last named are famous for the perfection of their

মতে উহা বিশুদ্ধ তাম্রনির্ম্মিত, ব্রঞ্জ বা পিত্তলনির্ম্মিত নহে। যে স্থানে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহার নিকটেই তাম্রের খনিজ, গলিত তাম্র, অপর একটি বৃহৎ তাম্র মূর্ত্তির হস্ত ও তিনটি ক্ষুদ্র তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে ঐ স্থানে তাম্রের একটি কারখানা ছিল।

এই মূর্ত্তিটির ওজন প্রায় এক টন বা আটাইশ মোণ হইবে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে এত বড় তাম্রের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা। দিল্লীর সর্ব্বজনবিদিত প্রকাণ্ড লৌহস্তম্ভও পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই লৌহস্তম্ভ ও তাম্রমূর্ত্তি দৃষ্টে পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের অতি উন্নত ধাতুশিল্পের জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতি প্রাচীন তাম্রনির্ম্মিত ঘট।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেজর হে (Major Hay) নামক এক সাহেব পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গারা জিলায় কুণ্ডলা নামক স্থানে একটী প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ হইতে এই তাম্রনির্ম্মিত ঘট বা লোটা প্রাপ্ত হন। উহা এক্ষণে বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এই ঘটটী সাধারণ লোটারই মত, কিন্তু তাহার গাত্রদেশে বিচিত্র কারুকার্য্য আছে। যুবরাজ সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইবার আগে চারিঘোড়ার রথে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে

---

execution in details and their wonderful platina, qualities especially noticeable in the examples which go back to the sixteenth or seventeenth century, notwithstanding the impurity of the metal.' "(M. de millone's Bod-roul on Tibet, p. 130, translated in V Smith's History of fine arts in India and Ceylon p. 198.)

অশ্বারোহী ও গজারোহী চলিয়াছে—ইহারই বর্ণনা কারুকার্য্যের বিষয়। এই কারুকার্য্যের প্রণালী দেখিয়া বার্ডউড সাহেব খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উহা খোদিত মনে করেন, ভিনসেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে ঘটটী খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত।*

সীসক।

সীসকের প্রাচীন নমুনাও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে সীসক প্রাচীনকালে মুদ্রা প্রস্তুতকল্পে ব্যবহৃত হইত। অন্ধ্র ও অন্যান্য রাজাদের সীসকনির্ম্মিত মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন যে পুরী ও ভুবনেশ্বরে পাথর আটকাইবার জন্য লৌহের কড়ির সহিত সীসক পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভের নিম্নভাগ মাটিতে প্রোথিত আছে। তাহা লৌহ-কীলক ও সীসক দ্বারা প্রস্তরে আটকান আছে। এই সীসক পঞ্চম শতাব্দীর নমুনা হইবে। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন দ্বিতীয় অনঙ্গপাল মথুরা হইতে এই স্তম্ভ দিল্লীতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, তখন ঐ স্তম্ভ আটকাইবার জন্য লৌহকীলক ও সীসক ব্যবহৃত হইয়াছে।

---
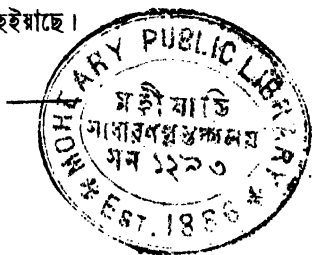
* Birdwood's Industrial Arts of India, p. 154 Vincent Smith, Ibid, p. 364. Burgess, Arch, Sur. West. Ind., Vol. IV., p. 6.